জধা

বিঝু-২০১৫

সম্পাদনায়

প্রণব চাকমা

সহ-সম্পাদক

জয়েস চাকমা

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি

(একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠন)

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

জধা

প্রকাশকাল

বিঝু

১৩ এপ্রিল-২০১৫খ্রিঃ

সম্পাদক

প্রণব চাকমা

সহ-সম্পাদক

জয়েস চাকমা

সম্পাদনা সহযোগীতায়

শান্তি চাকমা,অনুদেব চাকমা,নোবেল চাকমা তমেশ,বিপ্লব চাকমা,অনেজ কান্তি চাকমা, প্রশস্তি চাকমা,ধীরা তালুকদার,রতন মণি চাকমা ও শোভন চাকমা ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

লিটন চাকমা অন্নদা ও বিপ্লব চাকমা

প্রচ্ছদ

মামুন হোসাইন

বর্ণ বিন্যাস

দ্যানিস চাকমা

মুদ্রণ

ছড়াথুম পাবলিশার্স, রাঙামাটি।

শুভেচ্ছা মূল্য

২০০ টাকা মাত্র

যোগাযোগ

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি

বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

ই মেইলঃ bkkksrj@yahoo.com

www.banajogichara.org

Contact Adress:

Banajogichara Kishor Kishori Kalyan Samity

Banajogichara, Jurachari

Rangamati Hill District

e-mail: bkkksrj@yahoo.com

www.banajogichara.org

উৎসর্গ

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুগম চাকমার মা

স্বর্গীয় মিনাক্ষী চাকমাকে

----------সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আমাদের মাঝে আবার হাজির হলো বৈসুক, সাংগ্রাই, বিঝু ও বিষু। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের কাছে এ উৎসব বিভিন্ন নামে পরিচিত হলেও, তাৎপর্য ও উদযাপনের দিক দিয়ে এটি সমান গুরুত্ব বহন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ঐক্যতার প্রতীক এ উৎসব।

তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের অনেক কিছু অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে হারিয়ে যেতে বসেছে। আগেকার সময়ে এ ঐতিহ্যবাহী দিনে আদিবাসীদের বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হতো যা বর্তমানে অনেকাংশে কমে গেছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নেই বললেই চলে। এ থেকে উত্তরণ জরুরী।

বনযোগীছড়া পাঠাগার নিয়ে আমরা গত কয়েকবছর অনেক সাড়া পেয়েছি, বিশেষ করে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ খুবই আশাব্যঞ্জক। আমরা এ পাঠাগারকে আরো এগিয়ে নিতে চায়, সমৃদ্ধ করতে চায়। এ অগ্রযাত্রায় সকলের ঐকান্তিক সহযোগীতা কাম্য। আমাদের প্রত্যাশা এ পাঠাগারকে এ অঞ্চলে অন্যতম পাঠাগার হিসাবে গড়ে তোলা ।

'জধা' একটি চাকমা শব্দ। যার বঙ্গার্থ 'বন্ধন'। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে গভীর ভাতৃত্ববোধ গড়ে উঠুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে আমাদের এক শান্তি ও ভাতৃত্ববোধের লীলাভূমি, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আমরা এ সংকলনটি উৎসর্গ করলাম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুগম চাকমার স্বর্গীয় মা মিনাক্ষী চাকমার নামে। যিনি ছিলেন এক সত্যিকার মমতাময়ী মা। আমরা তার বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

সংকলনে প্রকাশিত লেখাগুলোর বক্তব্য লেখকদের একান্তই নিজস্ব। লেখাগুলোর ব্যাপারে সম্পাদনা পরিষদ কোনভাবে দায়ী নয়। আমরা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছি সংকলনের প্রুফ সংশোধনের, তারপরও ভুল থেকে যাওয়া একেবারে স্বাভাবিক। আশা করি সংকলনে অনিচ্ছাকৃত ভুল পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বৈসুক, সাংগ্রাই, বিঝু ও বিষু বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। সবাইকে জানাই বিঝুর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

সূচীপত্র

কলাম/প্রবন্ধ

Migration turned Rulers into refugees/Prodhir Talukdar-৭
লেখকের দায়বোধ ঃ প্রেক্ষিত দেশ কাল সমাজ/শিশির চাকমা-১০
পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত পণ্যের বিপণন সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য বাঁধা উত্তরণে করণীয়/
শুভ্র জ্যোতি চাকমা-১৪
মারমা লোককাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য/ড. আজাদ বুলবুল-২৩
মাদি এক্কান চাঙমা জাদর মাঝারা/কে ভি দেবাশীষ চাকমা-৩০

চাঙমা কবিতা

মর স্বনর জুরোছরি/জড়িতা চাকমা-৫৬
কোচপাঙ তরে/প্রশস্তি চাকমা-৫৮
মুই এক জীবন আহ্‌রা/তরুন কুমার চাকমা-৫৯
জুনপহ্‌ত জুম্মবী/প্রগতি খীসা-৬০
সময়ান আদি যায় মুজুঙে/জগৎ জ্যোতি চাঙমা-৬২
দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহ্‌ল/কে ভি দেবাশীষ চাকমা-৬৩
জিংকানীর থুম ধুঝিত্‌/বীর কুমার চাকমা-৬৪
আত্যা নাদিনর দ্বি কধা/বারেন্দ্র লাল চাকমা-৬৬
নোনেয় গালনি/স্মৃতি জীবন তালুকদার-৬৯
রাঙা অল'ছরাগাং/বরদেন্দু চাকমা-৬৯
সিঝি ফুল বিঝু মূল বিঝু গোজ্যাপোজ্যা বিঝু/পাট্‌ টুরু টুরু চাঙমা-৭০
আধঙ/উদয় শংকর চাকমা-৭১
কুধু,লরবো জুম্মল্যান্ডান?/পহ্‌র চাঙমা-৭২
চিধে বুগ'র চিধে চিধে কধা/সঞ্চয় চাকমা-৭৩
আমি কাম্মো/পঠন চাকমা-৭৪
পুঝে মাঘে বাঘ গুজুরে/কাজল রেখা চাকমা-৭৫
মনে কয়/বিকেন চেগে-৭৬
আয় ফিরি আয়/ কলোরী চাকমা-৭৭
লোগাংয়ান মর লোগাংয়ান/মৃত্তিকা চাঙমা-৭৮
O Zinghani/Surat Kishor Chakma-৮২

গল্প/রূপকথা

পিঁপড়াদের পরের গল্প/নয়ন জ্যোতি চাকমা-৩৩
ভুল/মনোজ বাহাদুর-৪২
বিড়াল কন্যা(তঞ্চঙ্গ্যা কিসসা)/কথিকাঃ রম্ভাপতি তঞ্চঙ্গ্যা/সংগ্রহে-লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-৫৪

গ্রন্থ আলোচনা

দিগবন' সেরেত্তুনঃ মনের খাঁচায় বন্দি পাখির আর্তনাদ/বিপম চাকমা-৮৫

বাংলা কবিতা

শুভলগ্নে, আবার আসিবে ফিরে/চিত্রমোহন চাকমা-৮৯
স্বর্গের কাছাকাছি স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ/ অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা-৯১
তিনটি বাংলা কবিতা/সজীব চাকমা-৯২
কাঁদে মন কাঁদে প্রাণ/লালন চাকমা-৯৪
গোলাপের দুঃখ/রিপরিপ চাকমা-৯৫
মানুষের সমাজ গড়া/নমদীশ চাঙমা-৯৬
২০০০ সালের পাংখু পাড়া/রূপেন্দু বিকাশ চাকমা-৯৭
জোনাকি/রিমি চাকমা-৯৮
শিলিগুড়ি তুই কত আর পাল্টাবী/রাজা পুনিয়ানী-৯৯
হে শুভ বিঝু/ঝর্ণা চাকমা-১০০
হিল চাদিগাঙ/পরেশ চাঙমা-১০০
সাহানা দেওয়ান/বরদেন্দু চাকমা-১০১
পাবত্য চট্টগ্রাম শান্তি চাই/মিনাক্ষী চাঙমা-১০২

English Poem

Moment/Nirmal Kanti Chakma-১০৩
Lighiting Up/Tanmoy Chakma-১০৩

চাঙমা গীত

ভুলংতুলি মোন/চন্দন চাকমা-৮৩
ফুল বিঝু/চুংকু চাকমা-৮৩
চুবে চুবে কোচপানা/ কিশলয় চাকমা-৮৪
জীংকানি/কিকো দেওয়ান-৮৪

স্মৃতি কথা

আমার ছেলেবেলা/জির কুং সাহু-১০৪

নাটক

আঙস্যা সদগ/মৃত্তিকা চাঙমা-১১২

Prodhir Talukdar

Migration turned Rulers into refugees

Undoubtedly, the Chakmas were independent rulers once upon a time. Now they are refugees everywhere. The word CHAKMA means victims of partition, scapegoat of Indian national politics, ignored and mistreated people for 67 years. The **CHAKMAS** are one of the pro Indian populations whether they live in Bangladesh, India or elsewhere. It's a historically demonstrated fact that they have Indian ancestry, lineage to the gracious clan SAKYA, the Gaotama Buddha born in. They remain trustworthy to India no matter which party is in power to Delhi. Nevertheless, they have been presented as scapegoat for the interest of Indian politics since 1947. Furthermore, they are victimised both in Bangladesh and India by the politics of the Congress in particular since independence. Nevertheless, they are still optimistic and loyal to India even after their cry remained unheard, demand denied and rights unresolved for decades.

The CHAKMAS are massacred in Chittagong Hill Tracts (CHT) of Bangladesh, threatened in Mizoram, denied citizenship in Arunachal Pradesh and ignored in Tripura of India. They are being killed and uprooted by Muslim settlers in CHT, underprivileged and subject to be driven out by Mizos in Mizoram, evicted as refugee and dispossessed basic human rights by the Government and so called locals in Arunachal. So, total existence of the Chakmas is in jeopardy everywhere.

Honourable MP **SWARAJ KAUSHAL** once, mentioned in a letter to the then Deputy Prime

Minister **L. K. Advaniji**, "The CHAKMAS is a long story of sufferings. They are striving for survival of their identity between Islamic fundamentalism and Christian missionaries campaign for conversion. Sir, Chakmas are refugees not by choice. They are victims of partition because our leaders exchanged Chittagong Hill Tracts for Ferozpur. While all others have been rehabilitated Chakmas continue to be refugees in their own country." Today, we are convinced enough that Indian north east gained a lot by the CHT Peace Accord in 1997. Undoubtedly, non implementation of the accord has threatened the survival of the indigenous people of that region which is a vulnerable aspect to aggravate insecurity and instability in our Indian site too.

Bor Porong in 1964

Migration or relocation of people has occurred all through the human history. The indigenous communities are not exception. In some cases, they have lost their mainspring of their lives. All these scattered people are losing their root rapidly and being diversified significantly in association with many majority cultures where they live in. The basic cultural heritage and tradition are changing drastically that ultimately widens the critical differences among themselves. That is the crucial point of concern among the new generation.

It is a historical fact that the Chakma population presently living in Arunachal Pradesh migrated from the Chittagong Hill Tracts, now the south-eastern part of Bangladesh. The huge numbers of Chakma uprooted from their ancestral homeland in East Pakistan because of artificial lake created by damming on the river Karnafully in 1964. They neither compensated nor rehabilitated properly. As the people were very simple and not aware of their rights, the authority simply advised the affected families to go to the hills and survive there eating bamboo shoots. Knowing the tragic deprivation and dislocation of the Chakma people, the then Indian government and its people were sympathetic enough on humanitarian ground to welcome and settle the refugees. Hence, the Chakma are obliged forever to the people and the government of India.

However, the negligence for ages by the Government of India in resolving the Citizenship and other basic rights of the Chakmas is strongly condemnable. We came to know that the migrants were crossing the border mostly through Mizoram and it took even two years until complete settlement in NEFA (North Eastern Frontier Agency). The whole journey was full of suffering. Hundred of refugees mostly children died due to malnutrition and contagious diseases. Shortage of ration and medicine was very common in the transit camps all the way to final destination. Utanga Muni Chakma, the political secretary of the Assam government recalled, "Hundred were dying in the camps and there were no place for cremation of those large numbers of dead bodies."

Therefore, the journey of migration was horrific and painful. Whereas, we the new generation does not know about the recent past of our elders. The Chakmas are subject to harassment, deprivation and dislocation wherever they live in. In the mainland, the Bangladesh's south-eastern part CHT, government programs and its forces uprooted, dislocated and killed on the other. Thousand of

plain settlers brought to land indigenous people and rehabilitated forcefully displacing the them. On the other hand, Chakmas of India are also facing problem of survival particularly, in the states of Arunachal Pradesh. The Chakmas of Mizoram are not well too though they have a tiny CADC. They have been deprived for ages in many respects. The Chakmas in Tripura are comparatively safe and getting advanced educationally but economically they should go far.

So, the question of existence of the Chakmas everywhere is critically raised. The new generation should think of it and take timely step for overall survival and development of themselves to live with other communities peacefully. The role of others who are in services in Tripura, Mizoram and elsewhere, is very crucial. I personally heard many grievances expressed against the educated Chakmas from Arunachal those who are in job and forgot not only the homeland but also the parents, brothers and sisters, own community. They do not bother what is going on against their loved ones. The future of the whole generations have been leading into the dark of uncertainty. Some dedicated and committed young stars like Subimal Chakma once pioneered the movement of basic rights (Citizenship) for the Chakma and Hajong should take up the responsibility with a sense of urgency when other should not remain blind for self interest only.

.....

* Prodhir Talukdar,*Email: regaconnects@gmail.com*

শিশির চাকমা

লেখকের দায়বোধ ঃ প্রেক্ষিত দেশ কাল সমাজ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পাহাড়ি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৯৮২সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ভেঙে বান্দরবান এবং ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি নামে তিনটি নতুন জেলা করা হয়। এ তিন পার্বত্য জেলায় ভিন্ন ভাষাভাষি প্রায় এগারটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বসবাস। প্রাচীন কাল থেকে ম্রো,খুমি,বম,চাক,পাংখো,খিয়াং, ত্রিপুরা,মারমা,তঞ্চগ্যা,লুসাই ও চাকমারা এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। মূলত এরাই এ অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান। এ ভূমিজ সন্তানদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনধারা এক স্বতন্ত্রধারার মূল্যবোধে সমৃদ্ধ। তারা আবহমান কাল থেকে নিবিড়ভাবে তাদের স্বকীয় কাল সমাজবান্ধব রীতিনীতি প্রথা ও মূল্যবোধের চর্চা করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের বৈরী পরিবেশ প্রতিবেশের তাড়নায় তাদের সংস্কৃতি আজ গভীর সংকটে আবর্তিত। সংস্কৃতির রূপান্তর এবং সেই সাথে জীবনধারার গতিপথ দ্রুত বাঁক নিচ্ছে এক বিস্ময়ভরা অজানা পথে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এ অঞ্চলের পাহাড়ি মানুষরা প্রথম হোঁচট খায়। এ পার্বত্য অঞ্চল কী ভারতের অংশে নাকি পাকিস্তানের অংশে থাকবে এ নিয়ে অনেক রশি টানাটানি হয়েছে। এ নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের তখনকার নেতৃস্থানীয় গুটিকয় রাজনীতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। তাদের কেউ পাকিস্তানের পক্ষে কেউ ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলের নিরিহ সাধারণ মানুষেরা কোন সুযোগই পায়নি। উপেক্ষা,অবহেলা আর বঞ্চনার ইতিহাসের উদ্বোধন ওখানটায়। পার্বত্য অঞ্চল পাকিস্তানের অংশেই থাকলো।

পার্বত্য অঞ্চলের সংখ্যাধিক্য পাহাড়ি মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন জুম চাষ হলেও এ অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ জুড়ে কৃষি কাজ চলতো। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে প্রায় ১,৬৪,৮৪০একর চাষ যোগ্য জমি জলে ডুবে যায়। অনেক মানুষ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। অনেকে পাহাড়ের উচু জায়গায় আশ্রয় নেয় আবার একটি বিরাট অংশ ভিটে মাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে যায়। তখনকার সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতি পূরণ দিয়েছে বটে,তবে অভিযোগ ক্ষতি পূরণ পর্যাপ্ত ছিল না। অনেকে ক্ষতিপূরণের টাকা কাজে লাগাতে না পেরে নিঃস্ব হয়ে যায়। এ এক বিপর্যয়। এর জন্য পাহাড়ি মানুষ প্রস্তুত ছিলনা। এ অঞ্চলে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প হয়েছে বটে কিন্তু এ জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের সত্যিকার সুফল পেয়েছে বলে পার্বত্য পাহাড়ি মানুষ এখনো বিশ্বাস করে না। এ বিদ্যুৎ

কেন্দ্রের কাছে অনেক পাহাড়ি জনপদে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি।
একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাহাড়িদের অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। অনেক পাহাড়ি গ্রামে বাঙালিরা আশ্রয় নিয়েছিল। বর্তমান পানছড়ি উপজেলার লোগাং ধুধকছড়া তারাবুন্নে হয়ে অনেক বাঙালি শরনার্থী নিরাপদে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে গিয়েছে। সীমান্ত পাড়ি দিতে পাহাড়ি জনপদের পাহাড়িরা তাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করেছে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের এ অবদানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে তারা কী পেয়েছে। পাহাড়ি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তখন বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তা সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। জাতিসত্তা সমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও অধিকার আদায়ের লক্ষে তিনি জাতীয় সংসদে আবেগময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। তার যৌক্তিক দাবী চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে এম এন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবহেলিত জাতিস্বত্তা সমূহের অধিকার আদায়ের লক্ষে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে এখানে অনেক ঘটনা ঘটেছে। অনেক গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে। কয়েক হাজার পাহাড়ি শরনার্থী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। সমতল এলাকা থেকে হাজার হাজার বহিরাগত সেটেলার এনে তাদের দিয়ে পাহাড়িদের বসত ভিটা দখল করা হয়েছে। নগ্ন ভাবে মানবাধিকার লংঘন হয়েছে। পাহাড়ি জাতিস্বত্তা সমূহের আন্তঐক্য বিনষ্ট ও একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিভাজনের ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে। এখানকার অনেক জায়গার নাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলাকরন করে সংস্কৃতি ধ্বংসের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চলেছে,এখনো চলছে।

দীর্ঘ দু দশকের বেশী সময় সশস্ত্র সংগ্রামের পর ১৯৯৭সালে তদানিন্তন আওয়ামী লীগ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জনসংহতি সমিতি আবার প্রকাশ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে ফিরে আসে। পার্বত্য চুক্তির পরে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়। ধীরে ধীরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হতে থাকে। শান্তিকামী মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু বিধি বাম। সরকার পার্বত্য চুক্তি করে তা দ্রুত বাস্ত বায়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাতে এখানকার সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিল। এরপর দেখা গেল সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে অতি ধীর গতির নীতি গ্রহণ করল। সরকার পরিবর্তন হলো,নতুন সরকার আসলো। কোন সরকারই চুক্তি বাস্তবায়নে চোখে পড়ার মতো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটে গেল। চেঙেই মেয়োনি শংখ মাতামুহুরির জল অনেক গড়িয়েছে।

উপরের যে কথাগুলো আমি তুলে ধরলাম তা আমার লেখার মূল বিষয় থেকে সরে এসেছি কিনা বা প্রাসঙ্গিক হলো কিনা ঠিক জানিনা। তবে আমার বিশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী লেখক সাহিত্যিকরা উল্লিখিত বিষয়ে সবাই জ্ঞাত এবং সচেতন। বর্তমানে যারা লেখালেখি করছেন তারা সবাই দেশ কাল সমাজ সম্পর্কে সচেতন। একজন সচেতন লেখক তার লেখায় দেশ কাল সমাজের বর্তমান চালচিত্রই বাস্তবতার নিরিখেই তুলে ধরবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়,আমাদের লেখকদের সবাই কী বাস্তবতার নিরিখে তার স্বপ্ন বীজ রোপণ করেন ?

একজন সাধারণ মানুষ সমাজে যে অস্থিরতা অসংগতি সর্বোপরি জীবনকে যে ভাবে দেখে,একজন লেখক ও সেভাবে দেখে। সাধারণ মানুষটি তার অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে পায়না,লেখক পেয়ে যায়। এখন লেখক তার অনুভূতি ভাবনা উপলব্ধি প্রকাশ করবেন কী একান্তই নিজের জন্যেই? যদি তাই হয়,সেটি সাহিত্য কিনা প্রশ্ন থেকে যায়। আর তার অনুভূতি ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রটি যদি সবার জন্য অবারিত হয়,হতাশা বেদনা সুখ দুঃখ প্রতিফলনের আবহ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেটিই সার্বজনীনতা পেতে পারে এবং তা সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে।

লেখক সমাজে বসবাস করেন তাই তিনি সমাজেরই একজন। তিনি জীবনকে উপলব্ধি করেন,উপভোগ করেন এবং জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা হতাশার চিত্র তার মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখায় গেঁথে নেন। তিনি সত্যের প্রতিভূ। তিনি সত্যকে অন্বেষণ করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সবসময় সোচ্চার ও প্রতিবাদী। যে সমাজে তিনি বাস করেন,সে সমাজের,বৈষম্য,অন্যায়, কদাকার দিক ও অসংগতিগুলি তিনি নির্মোহ ভাবে তুলে ধরেন। তিনি সমাজমনস্ক ও প্রকারন্তরে সমাজের প্রতিনিধি হয়ে উঠেন। তাই সমাজের প্রতি তার দায়বোধের বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে।

একজন লেখকের তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আজ আমরা আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে গভীর সংকটে। আমরা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হতে চাই কিন্তু জোর করে আমাদের পরিচিতি উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নামে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এমনিভাবে ভাষা সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবেশ প্রতিবেশ বৈরী হয়ে উঠছে। আদিবাসীদের জমি বেদখল হয়ে যাচ্ছে সংরক্ষিত বনের নামে বনবিভাগ এবং সেনানিবাসের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। আদিবাসীদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা ভূমি প্রথাকে অস্বীকার কার

হচ্ছে। এক সময় যে বনে আমরা জুম চাষ করতাম,ফসল ফলাতাম সে বন দখল হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গার স্থানীয় নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। আমাদের বৈচিত্রময় সংস্কৃতি আজ গভীর সংকটে। আমাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রকে আমরা কাছে পাচ্ছি না। এ বিষয়ে লেখকদের আরো বেশী সংবেদনশীল হওয়া জরুরি।

পার্বত্য অঞ্চলে যে সব জাতিসত্তাগুলোর মানুষেরা বসবাস করে তাদের মধ্যে আন্তঃ জাতি ঐক্যর ভিত্তি আরো বেশী সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া উচিত। এক সময় এ আন্তঃ জাতি ঐক্য বিনষ্ট ও বিভাজন করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। এ ধরনের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়ে কেউ যাতে সফল হতে না পারে সে জন্যও লেখকদের এ বিষয়ে সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বর্তমানে তিন পার্বত্য জেলার ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী লেখকদের মধ্যে যোগাযোগ তেমন সুদৃঢ় নয়। তাই ঘনিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে লেখকদের মধ্যে টেকসই সেতু বন্ধনের বিকল্প নেই। শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অধিকার আদায়ে লেখকরা বিরাট কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই লেখকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে স্ব স্ব জাতিসত্তার সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্য কৃষ্টি ও মূল্যবোধ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। অস্তিত্বের সংকটে লেখকরা নির্বিকার থাকতে পারেনা। সময়ের আবাহন তাই বলছে। একটি জায়গা থেকে লেখনির মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তাই সংগঠনের প্রশ্ন সামনে চলে আসে। ঐক্য ও সংঘবদ্ধ থাকার জন্য শক্তিশালী একটি ফোরাম বা পাটফর্ম দরকার। এ বিষয়ে লেখকদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত এবং তা গঠন করতে হবে এখনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী জাতিসত্তাগুলোর নেতৃস্থানীয় লেখকদের সম্মিলনের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হতে পারে। যে ভাবে তাদের স্বকীয় ঐতিহ্যমন্ডিত জীবনধারা ও সংস্কৃতির রূপান্তর এবং বিজাতীয় রূপ নিচ্ছে তা সত্যিই উদ্বেগজনক। বিজাতীয় সংস্কৃতির নগ্ন আগ্রাসনের থাবা থেকে বাঁচতে এবং সংকট উত্তরণে তাই লেখকদের একটি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

.....

** শিশির চাকমা, শিক্ষক,সংস্কৃতি কর্মী ও জাক সদস্য, রাঙামাটি।*

শুভ্র জ্যোতি চাকমা

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত পণ্যের বিপণন সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য বাঁধা উত্তরণে করণীয়

বাংলাদেশের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান-এই তিনটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন কারণে দেশে-বিদেশে বেশ পরিচিত। ভূ-প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এ অঞ্চলটি অনেকের নিকট পছন্দের একটি এলাকা। এজন্য প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সবুজ বনানী এবং পাহাড়িদের জীবন প্রণালী ও সংস্কৃতিকে অবলোকন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ করে থাকেন। এখানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে দশ ভাষাভাষি ১১টি পাহাড়ি জাতিসত্ত্বা। ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বা হলেও তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। তাদের খাদ্যাভাস, চালচলন, রুচিবোধ, জীবিকার ধরন, শারিরিক গঠন ও অবয়ব ইত্যাদিতে বহুলাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সহজে গড়ে ওঠে এবং এ মেলবন্ধন শত শত বৎসর ধরে এখনো অটুট রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য ছোট-খাট পাহাড়, ঝিরি-ঝর্ণা ও নদী। সমতল এলাকার পরিমাণ একেবারেই নগণ্য। পাহাড় ও পাহাড়িদের স্বকীয় স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে পার্বত্য অঞ্চলকে সহজে পৃথক করা যায়।

পাহাড় ও পাহাড়িদের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির জন্য পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শত শত বৎসর ধরে পাহাড়ে বসবাসের কারণে পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে পাহাড় কেন্দ্রিক সংস্কৃতির নিজস্ব বলয় গড়ে ওঠেছে। পাহাড় যেন তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য সবকিছুই অনায়াসে, নির্দ্বিধায় বিলিয়ে দেয়, বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। এজন্য পাহাড়িদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বাইরে রেখে পাহাড়ের অস্তিত্বকে কল্পনা করা যায় না। কল্পনা করা বৃথা। পাহাড় যেন পুজিত হয় দেবতারূপে। নির্দিষ্ট এলাকার ভৌগলিক অবস্থার মধ্যে একাধারে বসবাসের ফলে যেকোনো জাতির মধ্যে এভাবে নবতর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এজন্য আমরা ভৌগলিক কারণে বিচ্ছিন্ন একই জাতির মধ্যেও সংস্কৃতির মধ্যে

পার্থক্য দেখতে পাই।

পাহাড় ও পাহাড়িদের মধ্যে এই যে নির্ভরতা আমরা দেখে আসছি তা যুগের সাথে সাথে কেন জানি কমে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার তাগিদে পাহাড়িরা জীবিকার মাধ্যম পরিবর্তন করছে। বলা যায়, পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে পূর্বেকার ন্যায় পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদ কমে আসায় পাহাড়িরা এখন আর পাহাড় নির্ভরশীল থাকতে পারছে। তাদের ঐতিহ্যবাহী চাষ পদ্ধতি 'জুম' থেকে অনেকে সরে এসে অন্য চাষ ও পেশায় মনযোগী হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষাগ্রহণের প্রতি অধিকতর মনযোগী হয়ে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন কলকারখানায় চাকরি গ্রহণ করছে উল্লেখযোগ্য পাহাড়ি। অন্যদিকে কিছু আয়-রোজগারের লক্ষে হস্তশিল্পের প্রতিও মনযোগী হয়ে অনেকে নানা ধরনের জিনিস বিকিকিনি করছে যা বিগত পনের বছরের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য হারে দেখা যেতো না। যেমন-পূর্বে পাহাড়ি রমণীরা পরনের পোশাক শুধুমাত্র নিজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করতো। এখন অনেক পাহাড়ি রমণীকে পরনের পোশাক বুনন করত: বিক্রি করতে দেখা যায়। অনেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে ভাল ব্যবসা করছেন। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হবে।

সন্মানিত অতিথিবৃন্দ, আলোচ্য প্রবন্ধের শিরোনাম পড়ে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এর কারণ, সংস্কৃতির সকল উপাদান বিপণনযোগ্য নয় অর্থাৎ বিপণন করা যায় না। তাই বিপণনযোগ্য সংস্কৃতির উপাদানসমূহকে জানার জন্য আমাদেরকে সংস্কৃতি কী তা আগে জানতে হবে। আমরা অনেকে সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে শুধুমাত্র সঙ্গীত ও নৃত্যকে বুঝে থাকি। সংস্কৃতির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেয়া আসলে কঠিন। অনেক নৃ-বিজ্ঞানী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন যার মধ্যে E.B Tylor প্রদত্ত সংজ্ঞাটিতে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তাঁর মতে,সংস্কৃতি হলো যৌগিক সমষ্টি যেখানে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, প্রথা এবং অন্যান্য অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও মানুষের ধ্যান-ধারণা, খাদ্যাভাস, রীতি-নীতি, চাল-চলন, রুচিবোধ দৃষ্টি-ভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, জীবন-যাপন প্রণালী ইত্যাদি সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। তাই সংস্কৃতি অবলোকন করে যে কোনো জাতির রূপরেখা সহজে অনুমান করা যায়। সংস্কৃতি হল বহুলাংশে কোনো জাতির বেঁচে থাকার প্রাণ। সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-বস্তুগত সংস্কৃতি এবং অবস্তুগত সংস্কৃতি। অবস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে-জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, চালচলন, রুচিবোধ, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদি। কাজেই এগুলো বিপণন প্রক্রিয়ায় যায় না। অন্যদিকে বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে-মানুষের তৈরি জিনিসপত্র, খাদ্য-সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, গয়না ইত্যাদি। এগুলোর বিপণন চলে। আলোচ্য প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্ত্বাসমূহের সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রীর বিপণন নিয়ে

আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

বস্তুগত উপাদানের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র যেগুলো পাহাড়িরা তাদের নিজস্বতায় প্রস্তুত করে থাকে সেগুলো আমি দু'টি ভাগে ভাগ করেছি।

১. বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি জিনিস

২. নিজস্ব বুনন শৈলীর মাধ্যমে তৈরি করা পরিধেয় বস্ত্র ও ব্যবহার্য জিনিস।

ঐতিহ্যগত জ্ঞান বা উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি পাহাড়ি জাতিসত্ত্বা বাঁশ ও নানা জাতের বেত দিয়ে ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত। গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত সব ধরনের জিনিস তারা নিজেরাই প্রস্তুত করে থাকে। নামে ভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি জাতির তৈরি করা জিনিসপত্রসমূহ আকারে ও ডিজাইনে প্রায় একই। বুনন শৈলীর মধ্যেও যথেষ্ট মিল দেখতে পাওয়া যায়। এক একটি জিনিস বুনন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন শৈলীতে। যেমন-তাদের এ সকল জিনিস দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজে এবং কৃষি কিংবা জুম নির্ভর সমাজে অত্যাবশ্যকীয়। বর্তমান সময়ে পাহাড়িদের নিজস্বভাবে তৈরি করা জিনিসপত্র অনেকটা বিলুপ্তির পথে ধাবমান। আধুনিকতার ছোঁয়া এবং কৃষিনির্ভরতা কমে আসায় এ সকল জিনিসপত্রাদির ব্যবহার প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে এমন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়। পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতির বহুত্বতা রক্ষায়ও কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যারা শহরে বাস করে, যাদের পেশা কৃষি নয় তাদেরকে কীভাবে বাঁশ কিংবা বেত দিয়ে তৈরি জিনিস ব্যবহারে আকৃষ্ট করা যাবে ? এক্ষেত্রে আমরা স্যুভেনুর উপকরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারি। অর্থাৎ শোভা বর্ধনমূলক শো-পিস উপকরণ তৈরি করা যায়। কোনো একটি নতুন জায়গায় বেড়াতে গেলে মানুষ এ ধরনের জিনিস ক্রয়ে বেশি আগ্রহী থাকে।

কোনো একটি জাতির পোশাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে তার পরিচয় বা সংস্কৃতির অন্যতম একটি অনুষঙ্গ। বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, পার্বন কিংবা সামাজিক-ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অত্যন্ত আগ্রহভরে মানুষ তার নিজস্ব পোশাক পরিধান করে থাকে। বলা যায়, পরিধান করে মানুষ তৃপ্তবোধ করে। এসব বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্ত্বাসমূহও পিছিয়ে নেই। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, ১১টি পাহাড়ি জাতিসত্ত্বার পোশাক-পরিচ্ছদ একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা। নিজস্ব পোশাক পরিধানে মহিলারা এগিয়ে রয়েছে। তাদের কারুকার্যময় পোশাক সকলের নজর কাড়ে। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক সময়েও পাহাড়িদের পরিধেয় বস্ত্রের নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হচ্ছে-বিশেষত চাকমা পোশাক অন্য জাতিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যদিকে পাহাড়ি কাপড়ের নক্সাগুলো প্রয়োগ করে নানা ধরনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে

পাহাড়িদের চেয়ে বিত্তবান বাঙালি টেক্সটাইল মিলের মালিকরা এগিয়ে রয়েছে। আশ্চর্যজনক তথ্য হচ্ছে, বর্তমানে চাকমা ও ত্রিপুরা মহিলাদের পরিধেয় পোশাক নরসিংদী জেলায় তৈরি হচ্ছে খোদ বাঙালি বুনন কারিগর দ্বারা। কম মূল্য হওয়ায় সেখানে তৈরিকৃত পোশাক পার্বত্য এলাকার পাহাড়ি নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করছে। এ দ্বারা এটি বোঝা যায় যে, পাহাড়ি রমণীদের পোশাকের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এবার এ নিয়ে সামান্য অনুসন্ধান করা যাক।

আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার সুবিধার্থে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আমি রাঙামাটির রাঙাপানি গ্রামে প্রাথমিক অনুসন্ধান করি। আমরা সকলে জানি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে রাঙাপানি চাকমা পরিধেয় বস্ত্রাদি বুননের অনন্য একটি গ্রাম। এজন্য এ গ্রামটি এখন দেশে-বিদেশে বেশ পরিচিত। সম্ভবত এ গ্রামের মহিলারা ব্যক্তি উপায়ে প্রথম পিনন-খাদি বিক্রি করতে শুরু করেন। এখানে প্রায় প্রতি ঘরে বিক্রির জন্য পরিধেয় বস্ত্রাদি বুনন করা হয়। মিসেস দিবরি চাকমা এ সকল মহিলাদের মধ্যে অন্যতম সফল একজন মহিলা। বিগত প্রায় ৩০ বৎসর ধরে তিনি শুধুমাত্র চাকমা পরিধেয় বস্ত্রাদি বিক্রি করে আসছেন এবং সংসারের যাবতীয় খরচ মেটাচ্ছেন। তাঁর তিন ছেলেকে বড় করে বিয়ে দিয়েছেন। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বর্তমানে রাঙাপানি গ্রামের ১২জন চাকমা মহিলা পিনন-খাদি ব্যবসার সাথে জড়িত। তারা হলেন-মলিকা চাকমা, কণিকা চাকমা, দুর্গপুদি চাকমা, কাঞ্চন মালা চাকমা, জয়মালা চাকমা, বুদ্ধমালা চাকমা, সুন্দরী চাকমা, মিতা চাকমা, নরপুদি চাকমা, জামাপুদি চাকমা, সচ্চনা চাকমা এবং দিবরি চাকমা। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে প্রতিটি চাকমা পল্লীর মাটির উপর তাদের পায়ের ছাপ পড়েছে। অর্থাৎ তারা ঘুরে ঘুরে পিনন-খাদি বিক্রি করে থাকেন। পাশের গ্রাম ভেদভেদির বেশ কয়েকজন মহিলাও এ ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন। তারা ঘরে ঘুরে বিক্রি না করে শনি ও বুধবারের হাটের দিন পিনন-খাদি বিক্রি করে থাকেন। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর মাসিক গড়ে বিক্রির পরিমাণ ৪০-৫০ হাজার টাকা। গড়ে তাদের মাসিক আয় হয় ন্যুনতম ১৫ হাজার। প্রসঙ্গত যে, বর্তমানে কোমর তাঁতে রেয়ন সুতায় বুনন করা সাধারণ একটি পিনন ও খাদির মূল্য ২ হাজার টাকা। ডিজাইন অনুসারে এ দাম ৬-৭ হাজার টাকা পর্যন্ত। সৌখিন মহিলাদের কাছে বর্তমানে রেয়ন সুতার পিনন-খাদির চাহিদা বেশি। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বা অন্যান্য পার্টিতে মহিলারা রেয়নের পিনন-খাদি পরিধান করে থাকে। বাড়িতে সাধারণত সুতি সুতায় বুনন করা করা পিনন-খাদি পরতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চাকমাদের পিনন-খাদির ডিজাইনে নজরকাড়া পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি বিপণনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে রাঙামাটিতে বেশ কয়েকটি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-বেইন, বনানী,

বয়ন, রাঙা, তন্তুজ ইত্যাদি। এ সকল মিলে চাকমা, ত্রিপুরা পিনন-খাদি ছাড়াও পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী নক্সা ব্যবহার করে নানা ধরনের ব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা হচ্ছে। পাহাড়ি নক্সা ব্যবহার করার কারণে এগুলোর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ সকল পণ্য বিক্রির জন্য রাঙ্গামাটি শহরে টেক্সটাইল মিলগুলোর বেশ কিছু বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি বিক্রয় কেন্দ্রে এ জাতীয় পণ্যে বিক্রি হয় মাসে গড়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও এ সকল প্রতিষ্ঠানের কক্সবাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কক্সবাজার থেকে বিক্রয়ের পরিমাণ আরো বেশি হবে বলে আমরা মনে করি। বোঝা যাচ্ছে, পাহাড়ি পোশাক-পরিচ্ছদের বিশাল বাজার রয়েছে। আমরা জানি, মিয়ানমারে বিশাল সংখ্যক চাকমা বাস করে। মূল জাতিগোষ্ঠী থেকে শত শত বছর ধরে বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা নিজস্ব পোশাক ব্যবহার করে না। এমনকি বুনন প্রক্রিয়াও জানে না। সাম্প্রতিক সময়ে তারা স্ব-জাতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে বেশ উদগ্রীব হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তারা পাহাড়ি কাপড়-চোপড় বিশেষত পিনন-খাদি সংগ্রহ করছে। এর ফলে চাকমা পিনন-খাদি ও অন্যান্য কাপড়ের বাজার আরো সম্প্রসারিত হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য দু'দিক থেকে সুখবর-মিয়ানমারের চাকমারা স্ব-জাতীয় সংস্কৃতিতে ফিরে আসবে, পিনন-খাদি এবং অন্যান্য পাহাড়ি কাপড়-চোপড়ের চাহিদাও বাড়ছে। এক সময় বলা হতো একমাত্র তেল ও লবণ ব্যতীত পাহাড়িরা বাজার থেকে অন্য কোনো জিনিস ক্রয় করতো না। এ ধরনের তথ্য এখন অলিক মনে হতে পারে। যুগের সাথে সাথে এটি পরিবর্তন হয়েছে। বাজারের উপর পাহাড়িদের নির্ভরশীলতা এত বেড়ে গেছে যে বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্রাম কিংবা শহর সবখানে একই অবস্থা। তবে আশার কথা হচ্ছে, পাশাপাশি নিজস্বভাবে তৈরি করা জিনিসপত্র বিক্রি করেও পাহাড়িদের আয়ের উৎস বেড়ে গেছে। একটি জাতি সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা গণ্য করতে পারি। উল্লেখ্য যে, পিনন-খাদি ব্যবহারে চাকমা পুরুষদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্বে অধিকাংশ চাকমা পুরুষ মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি স্পর্শ করতো না। এখন সর্বক্ষেত্রে পিনন-খাদি দিয়ে তৈরি করা ব্যাগ চাকমা পুরুষদের কাঁধে নিয়ে ঘুরতে দেয়া যায়।

পাহাড়িরা উৎপাদন করতে পারে। উৎপাদনে তাদের কোনো আলস্যতা নেই। কিন্তু বাজারজাতকরণে তাদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না। বিকিকিনিতে অধিকাংশের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বেশিমাত্রায় মূল্য পাওয়ার জন্য তারা কৌশলী নয়। স্বল্প মূল্য পেলে তারা তাদের জিনিসকে বিক্রি করে দেন। ফলে মধ্যবর্তী ব্যাপারীরা অধিক মুনাফা করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, আলস্যতার কারণেও অনেকে নিজের উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রি করতে চান না। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের বেশি মূল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি তারা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের

মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে থাকে। ইদানিং তাদের এই সনাতনী চেতনাবোধে কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

কোনো জাতির মধ্যে উৎপাদিত জিনিস যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা যদি শুধুমাত্র স্ব স্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপণন সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটির চাহিদা এত বেশি হবে না। এজন্য অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও যাতে চাহিদা সৃষ্টি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐ জিনিসের চাহিদার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তাহলে আমরা কি আমাদের ঐতিহ্যকে বিকিয়ে দিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থকে প্রাধান্য দেবো ? উত্তর না হওয়ায় যথাযথ। আমি মনে করি ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে আমাদেরকে আধুনিক হতে হবে। এতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকার পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুবিধাও অর্জন করা সম্ভব। সোজা কথায় বলতে গেলে আমাদের নিজস্ব জিনিসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি যথাযথ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন-বর্তমানে বাঙালি শাড়ির মধ্যে পাহাড়ি মহিলাদের পরনের কাপড়ের ডিজাইনের ন্যায় পাইল দেয়া হচ্ছে। শাড়ির ডিজাইনে এটি অবশ্যই আকর্ষনীয় একটি ডিজাইন যা আধুনিক শাড়ির ফ্যাশনে নতুন সংযোজন যা বাঙালি রমণী হোক কিংবা অন্য জাতির রমণী হোক তাদের বেশ মানায়। বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক রমণীকে এ ধরনের ডিজাইনের শাড়ি পরতে দেখা যায়। বেইন টেক্সটাইলের প্রতিষ্ঠাতা ও সত্ত্বাধিকারী মিসেস মঞ্জুলিকা খীসা আমাকে জানিয়েছেন যে, ***কে ক্রাফট*** নামক পোশাক তৈরির প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারী শাড়ির উপর প্রথম চাকমা পিননের পাইল(চাকমা ভাষায় ***পেইল***) ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য উদাহরণে আমরা পাহাড়ি সংস্কৃতির প্রভাব অন্য জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। রুচিবোধের মধ্যে সংস্কৃতির অনুষঙ্গ জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব হলে সেটি ভিনজাতীয় সংস্কৃতি হলেও মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। সংস্কৃতির বাঁধাহীন গন্তব্য এভাবে অন্য জাতির সংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করে যাকে সহজে রোধ করা কঠিন।

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ভোজনপ্রিয়। কোথাও বেড়াতে গেলে কিংবা প্রয়োজনে যাওয়া হলে মানুষ প্রথমে কিছু খাওয়ার চিন্তা করে থাকে। খাওয়ার মধ্যে সাধারণভাবে স্থানীয় খাবার বেশি গুরুত্ব পরে কিছু কেনার প্রবৃত্তি জন্মে। তাতেও স্থানীয়ভাবে তৈরি বা উৎপাদিত জিনিসকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ পর্যায়ে আমি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর খাবার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর খাবার ও রান্নার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে নিজস্ব কিছু মসলা। স্বাদে ও গন্ধে এ সকল মসলা তাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ***সাবারাং*** ও ***নাপ্পি*** এগুলোর মধ্যে অন্যতম। নামে ভিন্নতা থাকলেও তাদের অধিকাংশ খাবারের রান্নার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াতে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে খাবারের

মধ্যেও সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন-মারমাদের ***শেচ্‌ব মু*** ও খিয়াংদের ***সাইতুই দা:বাইং***, চাকমাদের ***বিনিপিঠা*** ও মারমাদের ***ড: মু***-এর মধ্যে আকৃতিগত ও প্রক্রিয়াগত মিল রয়েছে। তরকারির মধ্যে অনেক মিল আমরা দেখতে পাই। তরকারি বিশেষত সবজি তরকারি রান্নায় তেল ব্যবহার করার প্রবণতা কম দেখা যায়। সবজি তরকারিতে তারা কদাচিৎ তেল ব্যবহার করে থাকে। সবজি তরকারি রান্না করার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মশলা ***নাপ্পিই*** ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কিছু কিছু সবজি তারা শুধুমাত্র সিদ্ধ করেই খেয়ে থাকে। সিদ্ধ করে খাওয়া আমরা বিশেষত মঙ্গোলীয় জাতিদের মধ্যে বেশি দেখতে পাই। যেমন-চিন, থাইল্যান্ড, লাউস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষের মধ্যে সিদ্ধ করে খাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। হয়তো ঐতিহাসিক যোগসূত্র রয়েছে বলে এ মিল রয়েছে। চাকমা ***বিনিহঘা*** পিঠার ন্যায় থাইল্যান্ডেও তৈরি করা হয়। পর্যটকদের সুবিধার্থে তারা পানেরখিলি থেকে সামান্য বড় করে এ জাতীয় পিঠা বিক্রি করে থাকে। দোকানে সাজিয়ে রাখা এ পিঠাকে অনেকে পানেরখিলি বলেও ভুল করতে পারেন। থাইদের এ বিপণন পদ্ধতিটি আমাদের এখানেও প্রয়োগ করতে পারি। শুধু বিনিহঘা পিঠা নয় অন্যান্য জাতিদের পিঠা বিপণনেও এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যায়। কারণ ইতোমধ্যে পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলো অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখানে অতিশয় ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। যার কারণে অনেক ক্রেতা মুখ ঘুরিয়ে নেন। বাজারে বিক্রি করা হয় এমন পিঠাতে দেখা গেছে সেগুলোতে নামে মাত্র কলা ও নারিকেল মেশানো হয়। একটি সম্ভাবনাকে আমরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করছি কি না তা মূল্যায়ন করা দরকার। অতিশয় মুনাফার প্রতি নজর না দিয়ে আমাদেরকে বাজার সৃষ্টি করার প্রতি নজর দেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, পাহাড়িদের খাবারের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা চাকমাদের খাদ্যসমূহকে উল্লেখ পূর্বক অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর খাদ্যকে জানার চেষ্টা করবো। প্রাথমিক গবেষণা করে চাকমাদের মধ্যে খাবার রান্নার ১৩ ধরনের পদ্ধতি জানা গেছে। এগুলো হচ্ছে-পুজ্যা, সিক্যা, কেবাং, উচ্যা, গুদেইয়ে, তাবাদ্যা, খলা গজ্যা, ভাজা, রান্যা, পোগোনতদ্যা, ঝুল, করবো, মরিচবাত্যা ইত্যাদি। বিচিত্র ধরনের রান্না ও খাবারের পদ্ধতি চাকমাদের জাতীয় জীবনের বর্ণাঢ্য অতীত রয়েছে বলে মনে করা হয়। নামে ভিন্ন হলেও অন্যান্য পাহাড়ি জাতিদের মধ্যে সমধর্মী রান্না ও খাবারের প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে মারমাদের আপ্রেং নামক তরকারি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য অন্যতম একটি তরকারি। পাহাড়িদের রান্না প্রক্রিয়ায় ও খাবারে কোনো প্রিজারভেটিভ কিংবা কৃত্রিম রঙ মেশানো হয় না। কাজেই এগুলোর সুষ্ঠু বিপণন করা সম্ভব হলে বড় অংকের টাকা আয় করা সম্ভব। পাহাড়ি খাবার হিসেবে অনেকে হীন দৃষ্টিতে দেখলেও অধিকাংশের নিকট পাহাড়িদের খাবারগুলো অত্যন্ত প্রিয়। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় বর্তমানে প্রচুর পাহাড়ি হোটেল

গড়ে ওঠেছে। এ সকল হোটেলে পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, তরকারি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়ে থাকে। তবে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছু বাঁধার মুখোমুখি হই। কারণগুলো নিম্নোক্ত মনে করি।

১. পাহাড়িদের তৈরিকৃত খাবারগুলোকে অনেকে তুচ্ছ মনে করা। যেমন-অমুক খায়, সমুক খায় ইত্যাদি।
২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাঁধুনি না থাকা।
৩. হস্তৈতরি পণ্যের মান কম হওয়া। কারণ তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকে না।
৪. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
৫. ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি।
৬. বিকিকিনিতে পাহাড়িদের মধ্যে সহনশীলতা কম হওয়া বা বিপণন কৌশল না জানা।
৭. প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা বা কাঁচামালের দুস্প্রাপ্তি।
৮. পর্যটন শিল্পের দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণ সৃষ্টি করতে না পারা।
৯. ডিজাইনের অভাব।
১০. কোমর তাতে উৎপাদন কম ও শ্রমসাধ্য।
১১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।
১২. ঐতিহ্যবাহী বুনন পদ্ধতি শ্রমসাধ্য বিধায় জিনিসপত্রের মূল্য বেশি হওয়া।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, পাহাড়িদের বিক্রয়যোগ্য সংস্কৃতিগত পণ্যসমূহের বিক্রয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রয়েছে কিছু বাঁধা। আমি মনে করি, এ সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হলে এখানকার পাহাড়ি জাতিদের তাদের বিদ্যমান আয়ের উৎস আরো সম্প্রসারিত হবে। পাশাপাশি পাহাড়ি সংস্কৃতির বিকাশসাধন সম্প্রসারণে গতিশীলতা আসবে। বিদ্যমান বাঁধাসমূহ নিরসনের লক্ষে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যায়।

দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে বর্ডার হাট চালু রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত জিনিসের বিকিকিনি করার জন্য তিন পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে বরকল, লোগাং, রামগড়, বিলাইছড়ি(ত্রিপিলাক নামক স্থানে) ও নাইক্ষ্যংছড়ির সীমান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে ৫টি বর্ডার হাট চালু করা যায়।
সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে এবং বিদেশে মেলার আয়োজন করা যেখানে বিক্রয়যোগ্য সংস্কৃতিগত উপাদানসমূহ বিক্রির ব্যবস্থা করা।
ঢাকা ও কক্সবাজারে পাহাড়িদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য দোকান খোলা যেতে পারে।

পাহাড়িদের খাদ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ঢাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম শহরে পাহাড়ি রেস্টুরেন্ট খোলা যেতে পারে। কারণ অনেক দেশের মানুষের খাদ্যাভাসের সাথে পাহাড়িদের খাদ্যের সাদৃশ্য রয়েছে।
বুননশিল্পীদেরকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
পাহাড়ি খাদ্যের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে আন্তর্জাতিক মানের খাবার তৈরি করা।
দেশে-বিদেশে রাঁধুনিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করার লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক টেক্সটাইল মেশিন স্থাপন।

বি:দ্র: আলোচ্য প্রবন্ধে চাকমাদের সংস্কৃতির পণ্যের বিপণন বিষয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এর কারণ-বর্তমানে চাকমাদের সংস্কৃতিগত পণ্যের বিপণন বেশি বিধায় এটির প্রভাব প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

[এ প্রবন্ধটি গত ১০.৪.২০১৫ খ্রিস্টাব্দে উন্নয়ন সংস্থা ***টংগ্যা*** কর্তৃক আয়োজিত The Plenary Session On Marketing of Indegenous Cultural Items শীর্ষক সেমিনারে পঠিত মূল প্রবন্ধ]

.....

* শুভ্র জ্যোতি চাকমা, গবেষণা কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙামাটি।
shuvrachakma71@yahoo.com

ড. আজাদ বুলবুল

মারমা লোককাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের মারমাগণ মূলত একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু। প্রকৃতির লীলায় বেড়ে ওঠা অরণ্যচারী মারমাগণ সহজ সরল জীবনযাপন করে। হাসি খুশি বিনয়ী ও কর্মঠ এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আরো দশটি জাতিগোষ্ঠীর সাথে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে একসাথে মিলেমিশে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে।

মারমাগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ট নৃগোষ্ঠী। বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় তাদের অধিকাংশের বসবাস। এছাড়া রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, মহেশখালী ও পটুয়াখালী এবং ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রদেশে তাদের বসতি রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তাদের জনসংখ্যা ১,৯৫,৭২৩ জন। 'বাংলাদেশে বর্মী সংস্কৃতির অনুসারীগণ প্রধানত তিনভাবে পরিচিত। তাদের পরিচয় বান্দরবান এলাকায় মারমা, কক্সবাজার এলাকায় রাখাইন এবং খাগড়াছড়ি এলাকায় বা মং সার্কেলে পেইংসা মগ' (সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা: ১৯৯৪: ৭৩)। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র একদা এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা বিচরণ করতো। তারা প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র ও সমরশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলো। মারমাদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত মঘা ভেষজ ঔষধ এদেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ভারতে 'মারমা থেরাপী' নামে আজও সুপ্রসিদ্ধ।

কেউ কেউ (আবদুল মাবুদ খান: ২০০৭) মারমা নৃগোষ্ঠীকে জুমিয়া মগ ও রাজবংশী মগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই শ্রেণিবিভাগের মধ্যে মারমাদের আসল পরিচয় নেই। মারমা ছাড়া আরো বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এ এলাকায় জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সেজন্য জুমিয়া শব্দটি জাতিবাচক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচয়জ্ঞাপক হতে পারে না। রাজবংশী মগ হিসাবে বোমাং রাজ পরিবারকে এককভাবে চিহ্নিত করাও যথার্থ নয়। এরা ছাড়া আরো অনেকের সঙ্গে 'ম্রকউ' (১৪৩০-১৭৮৪) রাজবংশের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। অপরাপর জনগোষ্ঠীর সাথে ভাষাগত তারতম্য মারমাদের অগ্রগতির অন্যতম অন্তরায়। 'নিজস্ব জাতিসত্তা সম্পর্কে সচেতন এই জাতির মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ; শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা, অফিস আদালতে প্রচলিত ভাষা, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদের নিজস্ব সমাজকে আরো পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর করে দিয়েছে' (মংক্য শোয়েনু নেভী: ২০০৮: ৮)।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে আরকানী ও বর্মী জনগণ মগ নামে অভিহিত হতো। এই নাম বা বিশেষণরীতি সুনাম দূর্নাম উভয় চরিত্রে মণ্ডিত। 'মগ শব্দের অর্থ দস্যু হওয়ার ধারণা আসলে কৃত্রিম কিন্তু এই অর্থের বহুল প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় আজকাল বর্মী ও আরাকানী বংশোদ্ভুতরা এ নামে পরিচিত হতে কুণ্ঠিত' (আতিকুর রহমান: ২০০০ : ৩৭)। 'বোমাং রাজা মং শৈ প্রু চৌধুরী ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের প্রতি মারমাদের মগ আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানান এবং ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে তাদের প্রকৃত জাতি পরিচয় মারমা তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ করেন' (অংসুই মারমা: ১৯৮৪: ৫২)। আতিকুর রহমানের (২০০০: ৩৭) মতে, ১৯৬৪ সালে বোমাং চীফ বান্দরবান মহকুমা প্রশাসকের নিকট এক চিঠির মাধ্যমে এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে, 'মগ নয়, মারমা নামই তাদের কাছে অভিপ্রেত।' যদিও মধ্যযুগে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে মগ, ফিরিঙ্গী, পূর্তগীজ জলদস্যুদের হামলা ও অত্যাচারে অতিষ্ট ছিলো এদেশের জনগণ এবং তাদের আক্রমণের বিস্তৃতি ছিলো বাংলাদেশের অভ্যন্তর পর্যন্ত।

মারমা ও রাখাইনদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এক হলেও তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় বহন করে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। মারমা ও রাখাইনদের মধ্যে আন্তঃ বিবাহ সম্পর্কও রয়েছে। এদের একদল পাহাড়ী, অন্যদল সমতলের অধিবাসী। এই দুই শ্রেণির আদিবাসীরা অভিবাসী হিসাবে আগমনের পটভূমি ও পূর্বপুরুষের পরিচয়ের ভিন্নতা দাবী করে। 'তথাপি সেই মগ জলদস্যুদের উত্তরসূরি বর্তমান রাখাইন ও মারমারা যে নয় সেই সত্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে' (মুস্তফা মজিদ: ২০০৪: ভূমিকা)।

মারমা লোককাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

লোককাহিনী প্রতিভাবান প্রাচীন লোকদের অনুপম সাহিত্যকীর্তি যা অলিখিত এবং চারণ কবিদের মুখে মুখে প্রচারিত মাটিগন্ধভরা এক বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারা। কোন জাতির প্রাচীন সভ্যতা ও জীবন সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি লোককাহিনীতে প্রতিফলিত হয়। আদিম মানুষের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে লোককাহিনী যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে আসছে।

মারমা লোককাহিনীর প্রায় পুরোটাই মৌখিক সাহিত্য হিসাবে প্রচলিত। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সাহিত্যপত্র 'গিরি নির্ঝর' ও 'সাংগু' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত জনপদের স্কুল ম্যাগাজিন ও পত্র পত্রিকায় গুটিকয় মারমা লোককাহিনী মুদ্রিত হয়েছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন মারমা লোককাহিনীর নাট্যরূপ নির্মাণ করে একে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। মারমা লেখিকা মাউচিং ২০০৮ সালে ১৮টি মারমা লোককাহিনীর সংকলন প্রকাশ করেছেন।

মারমা লোককাহিনীর টাইফ ও মোটিফ ভারতীয় লোককাহিনীর প্রায় অনুরূপ। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত লোককাহিনীর সমবেত ধারাই মারমা রূপকথার পটভূমি তৈরি করেছে। তবে বাংলার লোককাহিনীর সাথে মারমা লোককাহিনীর কতগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এতে জুমচাষী, অরণ্যচারী, আদিম শিকারজীবী মানুষের সংস্কৃতিই প্রতিভাত হয়েছে। বলা চলে মারমা সংস্কৃতির আদিম রূপটিই যেন তাদের লোককাহিনীতে প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

মারমা লোককাহিনীর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পরীর অবস্থান। পরীকন্যার অপূর্ব রূপ সৌন্দর্য, ভুলক্রমে বা শাপগ্রস্ত হয়ে মর্ত্যে আগমন, মানবের সাথে বিবাহ, স্বামীর প্রবাসযাত্রা, পতি বিরহ, পরীর নিজরাজ্যে গমন, পতিমিলনের পর মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি ঘটনাবলী মারমা লোককাহিনীর অন্যতম বিষয়বস্তু। মারমা লোককাহিনীর পরী কন্যারা অপূর্ব সুন্দরী। তাদের অহিংস নীতি, গৃহকর্মে নৈপূণ্য, সংসারী মানসিকতা, স্বামী সন্তানের প্রতি গভীর ভালবাসা যেন মারমা নারীর চিত্তকামনারই প্রতিরূপ। এখানে পরীকূল সৎ, খাঁটি, শুভবোধ ও মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত।

মারমা লোককাহিনীর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে রাক্ষসের উপস্থিতি। এখানে রাক্ষস নর রক্তলোভী, হিংস্র ও অশুভের প্রতীক হিসাবে চিত্রিত। ভারতীয় লোককাহিনীর মোটিফের মতোই ভোমরার ভিতরে রাক্ষসের প্রাণের কল্পনা এবং ভোমরার মৃত্যুর সাথে রাক্ষসের ধ্বংসের বিষয়টি মারমা লোককাহিনীতে লক্ষণীয়। তবে স্বাতন্ত্র্যের বিষয় হচ্ছে– এখানে রাক্ষস যদিও নারীরূপ ধারণ করে সংসার ধর্ম পালন করে কিন্তু সেখানেও রাক্ষস হিংস্র, নিষ্ঠুর, ক্ষতিকারক ও ধ্বংসকামী। রাক্ষস বিষয়ক লোককাহিনীর সমাপ্তি ঘটে মিথ্যার পতন ও সত্যের জয়ের মাধ্যমে।

মারমা লোককাহিনীর নায়ক হিসাবে বন্যপ্রাণিকে কল্পনা করা হয়। প্রায় লোককাহিনীর নায়ক বিড়াল, পেঁচা, কুমির শিয়াল, বাঘ, টিয়াপাখি, কুনোব্যাঙ, বানর ও সাপ। চাকমা ও ত্রিপুরা লোককাহিনীতে শুকরকে চরিত্র হিসাবে কল্পনা করা হলেও মারমা রূপকথায় শুকরের স্থান নেই। মারমা লোককাহিনীতে শিয়াল চতুর, ধুরন্ধর ও সুবিধাবাদী; বানর দুষ্ট ও অহিতকামী, কুমির ও বাঘ নির্বোধ, কুনোব্যাঙ মিথ্যাবাদী, বিড়াল লোভী, পেঁচা ও কাঠ ঠোকরা বুদ্ধিমান চরিত্র হিসাবে চিত্রিত। কিছু কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত লোককাহিনীগুলোর মধ্যে একটি সার্বজনীন ঐক্যবোধ রয়েছে। অর্থাৎ এগুলোকে কোন নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব কাহিনী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়না। একই বিষয়বস্তুর আলোকে প্রচলিত কাহিনী চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের মধ্যে কিছুটা পৃথক পরিবেশে, ভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বর্ণিত হয়। যেমন–

টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ, কুমির ও শেয়াল, বুড়োবুড়ি ও বাঘ, দুষ্ট বানর ইত্যাদি লোককাহিনীগুলো এই তিন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকটা অভিন্নরূপে প্রচলিত।

মারমা রূপকথার স্বাতন্ত্রজ্ঞাপক ও বহুল প্রচলিত কাহিনী হচ্ছে মনরী পরী। গোত্রভেদে এই লোককাহিনীর কিছুটা পাঠান্তর থাকলেও মারমাদের কাছে এটি পরম আদরের নিজস্ব কাহিনী। গল্পটি নিম্নরূপ–

স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সাত কন্যা মর্ত্যের রূপে মুগ্ধ হয়ে হিমালয়ের 'নাইওদা' সরোবরে স্নান করতে এলে এক ব্যাধের ফাঁদে পড়ে কনিষ্ঠা কন্যা মনরী ধৃত হয়। ব্যাধ অপরূপা পরী মনরীকে নিজের যোগ্য মনে না করে তাদের রাজার কাছে সর্মপন করে। যথারীতি মহা ধুমধামে রাজার সাথে মনরীর বিবাহ হয় এবং তারা এক পুত্র সন্তান লাভ করে নাম যার 'রুইখ্যো'। এদিকে বহিঃশত্রু নিধনকল্পে রাজা যুদ্ধে গিয়ে বহুদিন নিরুর্দ্দিষ্ট থাকলে মনরী স্বামী বিরহ আনমনা হয়ে পড়ে। এক সময় তার মনে পড়ে অতীত জীবনের কথা। মনরী পরী রাজ্যে ফিরে যাবার মনস্ত করে। শাশুড়ির কাছে স্বামীর জন্য একটি আংটি রেখে মনরী জানায় তার স্বামী ফিরে এলে আংটি নিয়ে যেন তাকে খুঁজতে পরীর দেশে আসে। মনরী বাপের দেশে চলে যাবার পরদিন রাজা ফিরে এসে জানতে পারে– স্ত্রীকে ফিরে পেতে হলে তাকে স্বর্গরাজ্যে যেতে হবে। রাজা মনরীর দেশে যাত্রা করল। পৃথিবীর শেষ সীমানায় গিয়ে সাগর পাড়ি দিল বিশাল এক অজগরের পিঠে চেপে। তারপর খুঁজে বের করলো এক জাদুকরী গাছ। সেই গাছের একটি ডাল মুখে পুরে রাজা পিঁপড়ার রূপ ধারণ করে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর পাখায় লুকিয়ে স্বর্গে পৌঁছালো। সেখানে রাজা দেখলো দাসীরা নদী থেকে কলসভর্তি জল তুলে মনরীকে স্নান করাচ্ছে। মর্ত্যে মানবের সাথে বসবাসের ফলে পরীকন্যার দেহে মানুষ্যগন্ধ লেগে আছে, তা দুরীভূত করতে এই জল ঢালার আয়োজন। রাজা সুযোগমত জলভর্তি কলসীর ভিতর আংটি ফেলে দিলে এবং সেই কলসীর জল মনরীর গায়ে ঢালার পর স্বামীর জন্য রেখে আসা আংটি দেখতে পেয়ে মনরী বুঝতে পারলো তার স্বামী স্বর্গে এসে পৌঁছেছে। পরে মনরী তার স্বামীকে পিতার কাছে নিয়ে তাকে বরণ করার অনুরোধ জানালো। ইন্দ্ররাজ মানব সন্তানকে জামাতা হিসাবে মানতে সহজে রাজি হলেন না। পরীকন্যার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষায় রাজাকে জয়ী হতে হলো। অবশ্য মনরীর পরামর্শে এবং তার বোনদের সহযোগীতায় বিজয়ী রাজাকে ইন্দ্ররাজ জামাতা হিসাবে বরণ করতে বাধ্য হন। পরে স্বামী সহ মনরী মর্ত্যে ফিরে এসে দেখতে পায় তার শিশু পুত্রটি ইতোমধ্যে বুড়ো হয়ে গেছে। মনরী বুড়ো পুত্রের দু'গালে চুম্বন দেবার পর পরই 'রুইখ্যো' শিশুবস্থায় ফিরে যায়। অতপর স্বামী সন্তান নিয়ে পরীকন্যা মনরী মর্ত্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

'বানরী বধু' লোককাহিনীতে দেখা যায়–

স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য রাজপুত্ররা তীর ছুঁড়ে সুন্দরী অনূঢ়া কন্যাদের আঁচল বিদ্ধ করতে পারলেও ছোট রাজকুমারের তীর গিয়ে পড়ে এক বানরীর লেজে। রাজার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অন্যান্য রাজপুত্রের সাথে আঁচলবিদ্ধ সুন্দরীদের বিবাহ হলেও ছোট রাজপুত্র বানরীকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। বানরীটি ছিল আসলে এক শাপগ্রস্থা পরী। রাজা একবার তার পুত্রবধুদের রান্না ও সেলাই কর্মের পরীক্ষা নিলেন। বানরী বধু পরীদের সহায়তায় সুস্বাদু রান্না ও উন্নত সেলাইকর্ম করে রাজাকে বিস্মিত করলেন। দিনকয় পরে রাজা পুত্রবধুদের সুসজ্জিত হবার পরীক্ষা নিতে গেলে বানরী বধু শাপ প্রদানকারী পরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে পূর্বতন রূপ ফেরত দিতে অনুরোধ জানায়। তখন পরীরাজ বানরী বধুকে শর্ত দেয়–পরী হিসাবে পূর্বরূপ ফিরে পেলে সে আর মানুষ্য সমাজে থাকতে পারবেনা। তাকে পরী সমাজে ফিরে আসতে হবে। বানরী বধু সেই শর্তে রাজী হয়ে পরীরূপ ধারণ করে এবং সুসজ্জিত হয়ে রাজার সামনে উপস্থিত হয়। তার অপরূপ সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ হয়। ছোট রাজকুমার ভারী খুশি হয়। বানরী বিবাহ করার কারণে এতোকাল সবার কাছে নানা ভাবে অপমানিত হলেও বানরী বধুর পরীরূপ দেখে তার সকল দুঃখ মুছে যায়। পরী বধুকে নিয়ে সুখে কালাতিপাতের কামনা তার মনে জাগলেও কিছু দিনের মধ্যে শর্তানুসারে পরীবধু নিজ সমাজে ফেরার জন্য আকাশে মিলিয়ে যায়।

কুমির ও শেয়াল, বেড়াল ও পেঁচি, কানকাটা রাজা, বুড়ো বুড়ি ও বাঘ, কুনো ব্যাঙের গল্প ইত্যাদি লোককাহিনী মূলত বাংলা রূপকথার প্রচলিত কাহিনীরই অনুরূপ। যেমন– কুমির তার সন্তানদের পন্ডিত বানানোর মানসে শেয়ালের কাছে পড়তে পাঠায় এবং শেয়াল কুমিরকে ফাঁকি দিয়ে কুমিরছানাগুলোকে খেয়ে ফেলে। পেঁচার বাচ্চা খাওয়ার জন্য বিড়াল নানা ফন্দি করলেও পেঁচার বুদ্ধিমত্তার কাছে বেড়াল হেরে যায়।

'কানকাটা রাজা' গল্পে দেখতে পাই–

ক্ষৌরকর্ম করতে যেয়ে নাপিত রাজার কান কেটে ফেললে কুপিত রাজা একথা কাউকে না জানানোর অনুরোধ করে। নাপিত দূর জঙ্গলে এক গাছের কাছে কথাটি ফাঁস করার পর এক ঢুলি তা শুনতে পায়। ঢুলি সে গাছের ডাল দিয়ে একটি ঢোল বানাবার পর সেই ঢোল থেকে আওয়াজ বেরুতে থাকে–'কান কাটা রাজা', 'কান কাটা রাজা'। রাজার অপমানে দুঃখিত হয়ে গাছটি দুষ্ট ঢোলবাদকের কথা রাজাকে জানিয়ে দেয় এবং রাজার কান জোড়া লাগানোর আশ্বাস দেয়। পরে ঢোলবাদকের কান কেটে রাজার কানটি জোড়া লাগানো হয়। রাজা অন্তঃপুরে গেলে রানী দেখতে পায় রাজার একটি কান কালো রঙের। এ নিয়ে রানী হাসাহাসি করলেও রাজার সান্ত্বনা– কাটা কানের চেয়ে কালো কান

ভালো।

অন্য একটি গল্পে দেখা যায়–

বুড়ি পিঠা খাবে তাই বুড়ো জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলে বাঘ পিঠা খাওয়ার আবদার করে এবং বুড়ো বাঘের কথায় রাজি হয়। পিঠা বানিয়ে বুড়ো বুড়ি মজা করে সবপিঠা খেয়ে ফেলার পর বাঘের কথা মনে পড়ায় তারা ভীত হয়ে একটি মাটির জালার ভিতর লুকিয়ে থাকলো। বাঘ পিঠা খেতে এসে কাউকে না পেয়ে ঘরে থাকা মাটির জালাটি পিঠে করে জঙ্গলের দিকে যেতে লাগলো। এদিকে পিঠা খেয়ে বুড়ো বুড়ি প্রচন্ড বেগে বাতকর্ম ত্যাগ করলে মাটির জালাটি সশব্দে ফেটে যায় এবং ভীষণ ভয় পেয়ে বাঘ মামা পড়ি কি মরি ছুটতে থাকে।

টুনটুনি ও কুনো ব্যাঙের গল্পটি টুনটুনি পাখিকে ভয় দেখানোর পরিণামে কুনো ব্যাঙের শাস্তি পাওয়া এবং তার পিঠ অমসৃণ হওয়া বিষয়ে–

তীর্থ থেকে ফিরে কুনো ব্যাঙ তার বন্ধু টুনটুনিকে জানালো– দুপুরের পর প্রচন্ড ঝড়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে টুনটুনির বাসাটি ভেঙে যাবে এবং যে গাছে তার বাসা সেটিও উপড়ে পড়বে। একথা শুনে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দিকবিদিক উড়তে উড়তে গর্ত ভেবে রংরাং পাখির নাকের ফুটোয় ঢুকে পড়ে। আতঙ্কিত রংরাং ভয়ঙ্কর শব্দে ডেকে উঠলে গাছের ডালে বসে মনের সুখে কুমড়ো খেতে থাকা বানরের হাত ফসকে ভারী কুমড়োটি নীচে শুয়ে থাকা গর্ভবতী হরিণের পিঠে পড়ে। হরিণ ভয় পেয়ে দৌড়ুতে শুরু করলে কুন্ডলী পাকানো অজগরের মাথায় শক্ত ক্ষুরের চাপ পড়ে। এতে রাগান্বিত হয়ে অজগর বন মোরগের সব ডিম খেয়ে ফেলে। ক্ষুব্ধ মোরগ ভেঙে দেয় পিঁপড়ার বাসা। পিঁপড়া কামড়ে দেয় শুকরের অন্ডকোষে। শুকর তছনছ করে কৃষকের কচু ক্ষেত। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করলে ক্রমান্বয়ে শুকর, অজগর, হরিণ, বানর, রংরাং পাখি ও টুনটুনির বক্তব্য শুনে রাজা বুঝতে পারলো– এতো সব ঘটনার পেছনে মূল অপরাধী হলো কুনো ব্যাঙ। রাজার নির্দেশে সেপাইরা কাঁঠাল গাছের ডাল দিয়ে কুনো ব্যাঙকে আচ্ছামত পিটুনি দেয়। সেই থেকে কুনো ব্যাঙের পিঠ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র ছোটছোট গুটিকা এবং ব্যাঙকে আঘাত করলে কাঁঠালের কষের মত সাদা রস বের হয়। মারমাদের এই লোককাহিনীটি অনেকটা অবিকৃত ভাবে চাকমা ও ত্রিপুরা লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়।

সর্প মানব রূপকথাটি 'ঠাকুরমার ঝুলিতে'ও পাওয়া যায়।

বিমাতার আদেশে রাজা তার সৎ কন্যাকে সাপের সাথে বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। সাপটি ছিল শাপগ্রস্ত রাজকুমার। মানবীর সাথে বিবাহ হওয়ায় সে শাপমুক্ত হয়ে যুবরাজে পরিণত হয়। সৎকন্যার স্বামীভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে রানী আপন কন্যাকে সাপের সাথে বিবাহ দিতে মনস্ত করে এবং সাপুড়েদের সহায়তায় জঙ্গল থেকে

বিশাল এক অজগর সাপ ধরে এনে হিংসুটে রানী তার কন্যাকে সাপের সাথে বিবাহ দেয়। বাসর রাতে অজগর নববধুকে গিলে খায়। সকালে রানী এসে দেখতে পায় সাপ যুবরাজতো হয়ইনি তদুপরী রাজকন্যাকে গিলে খেয়ে পেটটি তার ফুলে ঢোল হয়ে আছে। হিংসুটে রানীর তখন হাহাকার করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকেনা।

মারমা রূপকথায় রাক্ষসের লোভ ও স্বর্গরাজ ইন্দ্রের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দিলে নিজে শাস্তি পাওয়া, লোভের কারণে পতন ঘটা, চালাকী করতে যেয়ে নিজে বিপদে পড়া, হিংসার ফলে নিজের ক্ষতি হওয়া, ঋষির ধ্যানে বিঘ্ন ঘটানোর কারণে শাপগ্রস্ত হয়ে বন্যপ্রাণিতে পরিণত হওয়া এবং মানবের সাথে বিবাহের ফলে শাপমুক্ত হওয়া–এরকম অজস্র নীতিমূলক, শিক্ষামূলক ও উপদেশমূলক কাহিনী মারমা লোককাহিনীতে খুঁজে পাওয়া যায়। মারমা লোককাহিনীর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে হিতোপদেশ ও ঠাকুরমার ঝুলির অজস্র কাহিনীর মারমা রূপায়ণ। এতে কেবল ছায়া পড়েছে অরণ্যচারী, শিকারজীবী, জুমিয়া জীবনের বিচিত্র কর্মযজ্ঞ। মারমা রূপকথায় অলৌকিক, অবাস্তব, অতিপ্রাকৃত বিষয়ের পাশাপাশি মানুষের সহমর্মীতা, মমত্ববোধ, পিতৃস্নেহ, ভাতৃপ্রেম, হিংসা, ক্ষোভ, রিরংসা সবকিছুই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মারমা লোককাহিনীর অসংখ্য ধারা উপধারা এখনো লোকমুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করা গেলে মারমা লোকসাহিত্যের বিচিত্র স্বরূপ আবিস্কৃত হবে বলে আশা করা যায়।

.....

** **ড. আজাদ বুলবুল,** গবেষক,কথাশিল্পী,সহকারি অধ্যাপক,সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম*

কে ভি দেবাশীষ চাকমা

মাদি এক্কান চাঙমা জাদর মাঝারা

৯ আগষ্ট,২০১০ আদিবাসী দিননো পোইদ্যোনে উক্কু ম্যাগাজিন ফগদাঙ ওইয়ে বনযোগিছরা কিশোর-কিশোরি কল্যাণ সমিতি লিটন চাকমা অন্নদা, প্রণব চাকমার কাবিদেঙে। নাঙ রেঙ। ম্যাগাজিন্নো কি নাঙ, কক্কে ছাবা ওইয়ে গমে-দালে কোই ন' পারং। বানা সিয়েন নয়, কুধু কক্কে ম্যাগাজিন ছাবা অহ্র, লেঘা চাদন, সিয়েনও কোই ন' পারং। কন' কিচ্ছু কোই ন' পারং কিনেত্যেই মরে মুই ভাবং–মুই উক্কু বধুবাচ্যে ঘাধ' সাব। চাঙমাউনে কোই, বুধবারে ভিলে ঘাধ' সাব্বোই ন' লরে। মুই কেনে কোই পারং, মর উক্কু মানুচ আঘে। সিভেই কোই দে, কুধু কি ফগদাঙ অহ্র। যিভের কধা কঙর, সিভে যেন-তেন মানুচ নয়– চাঙমা জাদর মু অজল গোরি দিইয়ে, কবি, গীদ, নাটক রোজেইয়ে, স্বয়সাগচ্ছে পুরস্কার পেইয়ে নিজ দেঝত আ পরদেঝত নাঙ গোচ্ছে দাঙগু মৃত্তিকা চাঙমা। ত্হে অহ্লদে মর পেপার, রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট। কুধু কি অহ্র, কমলে ম্যাগাজিন ফগদাঙ অদন, কোই পাধায়।

দাঙগু মৃত্তিকাদাঘীরে নিইনে লেঘান এক্কানা লাম্বা গরং। ২০০২ সালত মর পথম লেঘা উপন্যাস কোচপানা দুগ ফগদাঙ ওইয়ে একুশে বই মেলাত, ঢাকাত্তুন। সেই পর পর তুই এবে, ব্যর্থ জীবনে কষ্টের কাহিনী, এক ফোদো চোঘো পানি, অধিকার উপন্যাচ্ছুন ফগদাং ওইয়ন। মহ্ উপন্যাচ্ছুন ফগদাঙ অভার আগেদি দাঙগু মৃত্তিকাদাঘীর কবিদে বই মন পরানী পচ্ছং। বানা মন পরানী নয়-নাটক বইও পচ্ছং। হালিক কবিদাঘীলোই কন'দিন দেঘা ন' অয়। নয়ও চিনং। আ আহ্ঝিবের কধা, মৃত্তিকা নাঙ বইয়োদ দেঘি মুই মনে গত্তুং কবিদাঘী মিলে। মরত ওক, মিলে ওক, কবিদাঘীর কবিদে, নাটক, গীদ পত্তে গম পেদুং। এনেও চাঙমা লেঘকর বই কমও পেদ' বাজারত। সেনত্যে আওজ গোরি চাঙমা লেঘকর বই পেলে কিনং। একদিন্যে শিল্পী, গীদ রোজেইয়ে, সুর দিইয়ে দাঙগু পঠনদাঘী মইধু এচ্ছুন।

তারলোই ভালক্কন কধা অহ্ল। মৃত্তিকাদাঘীর কধা তুলিলুং। পঠনদাঘীরে কলুং, ম লেঘা উপন্যাস মৃত্তিকাদাঘীরে নিইদি পারিবেক নাকি। তেহ্ পারিম কল'। মুইও খুঝি অহ্লুং। বইয়ুন পেই মৃত্তিকাদাঘী মে ফোন গোরিলেক। কলাক, বাঙলর ভাঝে ন' লেঘি চাঙমা ভাঝে উপন্যাচ্ছুন লেঘিলে আর' বেজ গম অভ'। মুই কলুং চাঙমা ভাঝে লেঘদে অম'কদ' আগত্তে পাং। মৃত্তিকাদাঘী ভারি গোরি উচ্চুনি তুলি দিলেক। কলাক, মুই এহ্ঝাল দিম। এম্বা কবিত্তুন এহ্ঝাল পেম, মুই অম'কদ' খুঝি অহ্লুং। চাঙমা ভাঝে লেঘিবের উচ্চুনি উধিলো। তে লেঘা ধল্যুং। লেঘানাও যেন তেন লেঘা নয়–বর লেখা। নাঙ দিলুং বেল্যা মাধান। বর লেঘা অহ্লেও কুধু বারং ঠিগ! লেঘি লাঘায় দিলুং পাধেয়। মহ্ লেঘাবো পেই মৃত্তিকাদাঘীর মাধা কাচ্ছনি উত্তে পারাপাং। তুও নে আলসি, নিমোন গোরি লেঘাবো ছোওর গোরি দুওন। সিত্তুন ধুরি চাঙমা ভাঝে লেঘানা মর। সে আগে বাঙলা ভাঝে লেঘিদুং। চাঙমা ভাঝে লেঘানা পুইধেনে মৃত্তিকাদাঘীর কৃতজ্ঞতা (চাঙমা ভাঝে কি অয়?) জানেম, তগেই শুক ন' পাঙর। বানা ইয়েন কোই পারং, মৃত্তিকাদাঘী বর চিভিট গাঝ, মুই লুধি। এধক্কানি কধা লেঘা পলদে, মৃত্তিকাদাঘী ন' অদাক সালেন তমা পেপারান (মাদি) ন' পেলুংউন। আদিবাসী দিননো নিইনে ফগদাঙ ওইয়ে রেঙ ম্যাগাজিন্নো লগে মাদি পেপারান পেয়ঙ।

ইক্কে এযং সালেন মাদি নিইনে–জুন মাঝত ১০ সালত ফগদাঙ ওইয়ে আট্য বঝরর মাদি পেপারান পেইনে ভারি গোরি গম লাগিলো। ভদাং ভদাং, ফরাক ফরাক চাঙমা লেঘা। চাঙমা লেঘা দেঘি মুই খুঝিয়ে আহ্ঝিলুং। মনে মনে ভাবিলুং–এসান্যে অহ্লে, কন' একদিন চাঙমা লেঘালোই চাঙমা ভাঝে পেপার পরি পেবং। তমা পেপারান পেই, রেদ ফোন গোরিলুং কবি মৃত্তিকাদাঘীরে। কলুং-পেপারান দোল ওইয়ে। এ বাবত্যেই পেপার ফগদাঙ অহ্লে বেজ দেরী নেই আমন' ভাঝে, আমন' নাধা (অক্ষুরে) পেপার পরি পাদে। মৃত্তিকাদাঘী আহ্ঝিলেক ম কধা শুনি। গম কাম গল্যে বেঘে আহ্ঝন। ভঝং কাম গল্যে বেঘে মু পিচ্ছেন। পেপারানর আট্য পাদা বেক্কানি নিমোন গোরি পরিলুং। বেক্কানি দোল ওইয়ে। গম লাক্কে। ইয়েন এক্কান দোল কাম। চাঙমায় চাঙমায় চিন পুচ্ছ থেবার মাঝারা। পিথিমির মানুচ্চুনেও কোই পারিবেক, চাঙমা নাঙে উক্কু জাদ আঘে।

আমি জাদ ইঝেবে কাজিয়াত্যেই মাঝারা ন' থেদং। আমা জাদর নেদাউনে লারেই গত্তন বন্দুক আহ্ধত লোইনে। রাজ পধত লামি ঝাক বুদি জগার পাত্তন। কিত্যেই লারেই গত্তন, মুই ভাবি উদো ন' পাঙ। তারা লারেই গরানাত কন' ব্যানারত চাঙমা জাদর মাঝারা নেই–ন পাং চাঙমা নাধা। কি চাঙমা ভাঝ, লেঘা, পিনোন-খাদি কি আঘে? হিল চাদি গাঙদ জাগা নাঙানি বেক্কানি লুগি যার। যিউনে ভারদত যেইনে আঘন, সিউনে তারা জাগানি তগেলি ন' পেবাক। কিত্যেই অহ্লে আগ' জাগা নাঙানি নেই। লুগি যেইয়ে। লুগি যার। বর বর সভাদ সবুল চাঙমা অন, তুও আমা নেদাউনে বাঙাল' ভাঝে বক্তা দুওন। আগে আমারে কধাক-

উপজাতি, জুম্ম, আদিবাসী। ইক্কে ভিলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি। ইয়েনিত্যেই কন্না লারেই গরের? জাদর সুঘত্যেই লারেই গোরি যিউনে মানুচ মারেই ফেলাদন, ভিদিরে ভিদিরে জাত্তো যে ভস্ম্ম যার, সিয়েন কোই ন' পারন, সিউনত্যেই তমা পেপারান বিরেট উক্কু থক।

এনেও চাঙমাউনে কনে কুধু আঘন কোই পারা ন' যার। কোই পারিবেরও নয়। এক্কুয় ধেই পল্লাদে কা খবর জন্না লর। ছিদে ছিট্যে গোরি থাগদে থাগদে চাঙমায় চাঙমায় চিন পুচ্ছ ন' থেবার ওইয়ে। বেরান ছেরান, বৌ আনা-আনি গোরি সোনা রেগা বানি চিন পুচ্ছ রাঘেবং সিয়েনও যু নেই। চাঙমায় চাঙমায় চিন পুচ্ছ থেবার এক্কান পধ অহলদে সাম্বাদ। বাঙলাদেজর আঘন্দে চাঙমাউনোর ছিটে ছিট্যে গোরি থানায় ইক্কে কক্সবাজার টেকনাফ চাঙমাউনে জাত্তুন ছিনি পরি আঘন। আগ' চাঙমা ধক কধা কলেও ঘরানি তুলিলেও পোঝাক্কানি আহ্রেই ফেলেস্নান। জাদেও কিয়ে চাঙমা চিন পুচ্ছ দুওন, কিয়ে চিন পুচ্ছ দুওন তঞ্চঙ্গে (তঞ্চঙ্গ্যা)। আঝলে তারা চাঙমা। বাঙলাদেজত টেকনাফ' চাঙমাউন' ধক্যেন ভারদত মিজোরামত, ত্রিপুরাত, অরুনাচল, আসাম, কলিকাতাত আর স্বয়সাগচ্যে জাগাদ আঘন্দে চাঙমাউনে অন নাকি কিজেনি। ন' অভাক্কেও কেনে কোই পারে–? জাদে জাদে চিন পুচ্ছ রাঘেবার এক্কান গোরি পধ আঘে, সিয়েন অহ্লদে পেপার। ছিদি পুচ্ছে আঘন্দে চাঙমাউনোর দুঘ, সুঘোর কধানি পেপার ছাবেই ফগদাং গোরিলে তে চিন পুচ্ছ থেবদে। আ ন' লে থেদ' নয়। তমা পেপারানে বানা জাদর মাঝারা রাঘেব'দে নয়- জাদর চিন পুচ্ছও রাঘেব। সেনত্যেই তমা ছাবেইয়ে মাদি পেপারান মত্তুন অম'কদ' গম লাগিলো। লেঘানি বেক্কানি গম লাক্কে। গম কামাত্যেই কাবিদেঙ সুমুত্ত বেক্কুনরে মর চিদ দিঘলী ভালেদি থেল'। গোজেনে তমারে গম রাগোক। গম থাগ'। গম থেইনে তমা কামান গোরি য্হ। একদিন তমারে মান্যে আহ্ধেবাক।

.....

** কে ভি দেবাশীষ চাকমা, কবি,কথা সাহিত্যিক ও সভাপতি, আদিবাসী কবি পরিষদ।*

নয়ন জ্যোতি চাকমা

পিঁপড়াদের পরের গল্প

প্রারম্ভ

পিঁপড়াদের সেই গল্পটি আমরা সবাই জানি। ঘাস ফড়িংরা তাদের কিভাবে শোষণ শাসন করত। শীতের জন্য তারা যা সঞ্চয় করত,তা থেকে অর্ধেক ঘাস ফড়িংদের খাজনা হিসেবে দিতে হত। ঘাসফড়িংদের এসব অন্যায় অত্যাচার তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হত। যে প্রতিবাদ করবে তার উপর নেমে আসত ভয়ংকর নির্যাতন। অন্যায় অত্যাচারের ভার সহ্য করতে না পেরে, পিঁপড়ারা একসময় প্রতিবাদী হয়ে উঠে। শুরু হয় বিদ্রোহ। পিঁপড়ারা দেয় প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা। শুরু হয় ঘাস ফড়িংদের উপর চোরা-গুপ্ত হামলা। প্রকাশ্যে এবং চোরা-গুপ্ত হামলায় ঘাস ফড়িংরা বিধ্বস্থ,অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। যার ফলে মৌমাছিদের মধ্যস্থতায় ঘাস ফড়িংরা এক সময় শান্তিত্ম চুক্তি করতে বাধ্য হয়। পিঁপড়ারা ভাবল ঘাস ফড়িংদের মত তাদের ডানা নেই, নেই তাদের মত উড়ার ক্ষমতা। ক্ষমতা,শক্তিতে কি তারা আদৌ তাদের সাথে পেড়ে উঠবে ? মৌমাছিদের কাছে রিফিউজি হয়ে কতদিন আর থাকা। তাছাড়া মৌমাছিদের খাদ্য সংকট,পিঁপড়াদের দিয়ে কিছু বিচ্ছিন্নবাদী বিদ্রোহীর বিদ্রোহ দমন, সে বিদ্রোহ নিস্তেজ হয়ে পরলে,পিঁপড়াদের প্রয়োজনীতা, উপযোগিতা তাদের কাছে ফুরিয়ে যায়। স্বার্থপর মৌমাছিরা শান্তিত্ম চুক্তির জন্য পিঁপড়া নেতাদের চাপ দিতে থাকে। তাই বাধ্য হয়ে পিঁপড়ারা শান্তিত্ম চুক্তি করতে বাধ্য হয়। চুক্তির পর তারা সুখে স্বস্থিতে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু সুখ কখনো চির স্থায়ী নয় তাই গল্প যেখানে শেষ হয় সেখান থেকে আবার শুরুও হয়। তাই এ গল্পটি পিঁপড়েদের পরের গল্প।

এক

শান্তিত্ম চুক্তির পর পিঁপড়াদের সব কিছু দ্রুত উন্নতি হতে থাকল। পথ-ঘাট,ব্যবসা-বানিজ্য,অবকাঠামো সব কিছু। তাদের এলাকায় অনেক লোকাল,দেশী,বিদেশী এনজিও ঢুকে পড়ে। এসব এনজিও গুলোতে পিঁপড়েদের কিছু কর্মসংস্থান তৈরী হয়। বিশেষ করে

বিদেশী এনজিও গুলোতে মোটা বেতনের চাকরী হয়,সাধারনত যারা একটু ক্ষমতাবান অথবা প্রভাবশালী তাদের। সরকারী চাকরীও পেল অনেক অনেক পিঁপড়া। চুক্তির পর ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিরাট বিপ্লব হতে থাকে। তাদের "হিংটিং" (হিংটিং হচ্ছে পিঁপড়াদের ধর্ম) ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়। ধর্মের স্রোত বন্যার মত প্লাবিত হতে থাকে পিঁপড়াদের মনে। হিংটিং ধর্মের গুরু 'থুকু' অনেক ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হয়ে উঠে। এবং তার শিষ্যেমন্ডলী তাদের ভূমির আনাচে-কানাছে তার মন্দিরের শাখা প্রশাখা খুলতে থাকে। এসব শাখা-প্রশাখা গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে কিছু পুঁজিপতি শ্রেনী। তাদের অর্থনীতির দ্রুত প্রসার ঘটায়। ব্যবসা-বানিজ্যের সুবিধা,বিদেশী এনজিও এবং সরকারী চাকরীর কারনে অনেক পিঁপড়ারও পুঁজি-পতি বাড়তে থাকে। কিন্তু এ সব সুযোগ সুবিধা তো সব পিঁপড়া পেল না যার ফলে যারা এসব সুযোগ সুবিধা পেল এবং যারা পেল না তাদের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হল যা আগে এতটা ছিল না,তা হল ধন-সম্পদের,ধনী-গরিবের,পুঁজির ব্যবধান। যারা সাধারণ, তারা সেই সাধারণ রয়ে গেল। সাধারণ পিঁপড়ারা আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করে এই শান্তিত্ম চুক্তিতে একটা বড় ধরনের শুভংকরের ফাঁক রয়ে গেছে। তার পরও তারা ততক্ষন পর্যন্তত্ম সুখি ছিল, যতক্ষন না ঘাসফড়িংদের কুটনৈতিক ষড়যন্ত্রের চালে তারা কয়েকটি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন না হয়।

কারণ ঘাস ফড়িংরা পিঁপড়াদের এই উত্থানকে লক্ষ্য করছিল আর মনে মনে হাসছিল। তারা জানে চুক্তির নিয়মে পুঁজি বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে। মানুষের উৎপাদিত সকল শস্য-পণ্য তাদের হাত ঘুরে তারপর পিঁপড়াদের কাছে যায়। পিঁপড়াদের ভূমি পরিণত হয় ঘাসফড়িংদের নব্য ঔপনিবেশ। পুঁজিবাজার অতি দ্রুত তাদের ভুমিতে ঢুকে পরায় তার সাথে তাল রাখতে গিয়ে পিঁপড়াদের অনেক রাজনৈতিক নেতা আদর্শ চূত হয়। অর্থ উর্পাজনের সহজ পথ খুজতে গিয়ে উচ্চাকাঙ্খায় অনেকে আবার ঘাসফড়িংদের দালালী শুরু করে। এসব আদর্শচূত, মেরুদন্ডহীন নেতা ও কিছু বিবেকহীন স্বার্থলোভী বুদ্ধিজীবিকে ঘাসফড়িংরা তাদের কাজে লাগাতে শুরু করে। তাদের দিয়েই তারা পিঁপড়াদের বিভাজন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে তারা বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত ও বিভাজিত হয়। সৃষ্টি হয় চার-পাঁচটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল। তার পর তারা পরস্পর স্বসস্ত্র সংঘাতে জড়িয়ে পরে। স্বসস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন,এসব অর্থ যোগান হতে থাকে সাধারণ পিঁপড়াদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। শুরু হল চাঁদা বাজির জন্য এলাকা দখলের যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা, ভাই-ভাইয়ে অযথা রক্তপাত এবং তা পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে। তাদের ছোট আবাস ভূমি আরও ছোট ছোট পাঁচটি খন্ডে অলিখিত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ পিঁপড়াদের অস্ত্রের মুখে চাঁদা দিতে হয় এবং মুখ বুঝে সহ্য করতে হয়। এ সব চাঁদার কিছু অংশ দিয়ে অস্ত্র কেনা হয় কিছু অংশ দিয়ে এসব নেতারা বিলাসি জীবন যাপন করে আর কিছু অংশ যায় ঘাসফড়িংদের হাতে। পিঁপড়াদের নেতারা পুরোপুরি

তাদের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাছে তাদের নির্লজ্জ শোচনীয় পরাজয় হয়। জয় হয় ঘাসফড়িংদের সামন্ত্য, ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী মানসিকতার।

পাঁচটি দলের চাঁদাবাজি, পিঁপড়াদের নিজস্ব কোন উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকা এবং পুঁজিবাজারের উপর সরাসরি কোন হাত না থাকায়, নব্য পুঁজিবাদি ব্যবস্থায় পিঁপড়ারা একটু ভিন্ন ভাবে আরও কঠিন এবং নিষ্ঠুর ভাবে শোষিত হতে থাকে। তার উপর তাদের হিংটিং ধর্মের গুরুরা বিভিন্ন ভেলকি ভাজি দেখিয়ে ধর্মের নামে, ধর্মকে পুঁজি করে, ধর্মের দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ পিঁপড়াদের শোষণ করে তারা বিলাসি জীবন যাপন করে। তার নেপথ্যে থাকে উঠতি পুঁজিবাদী এক শ্রেনী। নব্য পুঁজিবাদি ব্যবস্থা, নয়া সাম্রাজ্যবাদ,পুঁজিবাজারের আগ্রাসন তাদের সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করতে থাকে। এ কঠিন সংকট থেকে উত্তরণের পিঁপড়াদের আর কোন পথ খোলা থাকে না। অসহায় সাধারণ পিঁপড়ারা আরও অসহায় হয়ে পড়ে।

তারপরও কিছু বিবেকবান বুদ্ধিজীবি আর আদর্শবান কিছু নেতা ছিল না তা নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যাটা ছিল খুবই সামান্য। লক্ষ্য বিচ্যুত, নীতি-আদর্শ হারা পিঁপড়া নেতাদের সাধারণ পিপঁড়াদের উপর সামান্ত্য আগ্রাসন এবং আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিদের শাসক গোষ্ঠির উপর প্রভূভক্ত মানসিকতায় তারা লজ্জা ও অপমান বোধ করে। জাতির এ বিধ্বংসী বিশৃংখলা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু অপশক্তি এবং পুঁজিবাদী ক্ষমতার কাছে তারা খুবই নগন্য,অসহায়। তাই সে সব বুদ্ধিজীবিরা লোকসমাজের অন্তরালে নিজেদের গুটিয়ে ফেলে। আর সে সব আদর্শ ধরে রাখা নেতা গুলো বেছে নেয় স্বেচ্ছা নির্বাসন। আমাদের গল্পের নায়ক পিপড়া 'টিউ' সেই আদর্শবান নেতাদের একজন। যে কিনা জাতির এই বিভক্তি এবং নেতাদের সামান্ত্য আগ্রাসনকে মেনে নিতে পারে নি। তাই সে সরাসরি রাজনীতি থেকে নিজেকে ইস্তফা দিয়ে সভ্যতা বিচ্ছিন্ন একটি গ্রামে নিজের নির্বাসন নেয়। এখানে এসে পেশা হিসেবে সে বেছে নেয় শিক্ষকতাকে। এ গ্রামটি যে পুঁজিবাদী নেতাদের আগ্রসন মুক্ত, ধর্মীয় নেতাদের শোষণ মুক্ত, তা নয়। এ গ্রামের লোকদেরও প্রতিবছর বাৎসরিক চাঁদা এবং বছরের বিভিন্ন সময় কোন না খাতে পাঁচটি দলকে এবং ধর্মীয় নেতাদের চাঁদা দিতে হয়। সব কিছুতেই পিঁপড়াদের অবস্থা এখন কতটা প্রান্তিক টিউ তা বুঝতে পারে। এ সব শোষণ বঞ্চনা দেখেও কিছু করতে না পারার অপরাধ বোধ প্রতিনিয়তই তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। টিউ ভাবে এজন্যই কি আমরা দীঘ ১৮ টি বছর নিজেদের জীবন যৌবন বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম করেছিলাম! এ কেমন চুক্তি আমরা করলাম যার জন্য জাতি আজ চার-পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কিসের স্বার্থে,কার স্বার্থে আজ পিঁপড়া জাতির দ্বিধা বিভক্তি ? এ বিভক্তির নেপথ্যে যে শাসক গোষ্ঠি তা কি এখন

দিবালোকের মত স্পষ্ট নয়? কেন এই শোষণ বঞ্চনা ? কাক কাকের মাংস খায় না অথচ আমরা পিঁপড়েরা নিজেরাই নিজেদের মাংস খেয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত। টিউ স্বপ্ন দেখে তাদের জাতীর এই ক্রান্তিত্ম কালে পিঁপড়া জাতিতে এমন একজন নেতার উদ্ভব হবে, এমন এক নেতৃত্বের জন্ম হবে,যার নেতৃত্বে পিঁপড়া জাতি এক হয়ে নিজেদের মুক্তির জন্য সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের জন্য সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। কিন্তু কবে ?

টিউ যে স্কুলটিতে শিক্ষকতা করে সে স্কুলটি সরকারী নয়, তাই সরকারী ভাবে কোন খাদ্য শস্যও বাজেট নেই। গ্রামের পিঁপড়েরা নিজেরাই খাদ্য শস্য দিয়ে স্কুলটি চালায়। সেই খাদ্য শস্য দিয়ে টিউর সংসার টেনে টুনে কোন রকমে চলে। এই গ্রামে এসে গ্রামের সহজ সরল একটি যুবতী পিঁপড়ীকে বিয়ে করে সে বর্তমানে দুই সন্তানের জনক। বড় মেয়েটি ক্লাশ সেভেনে পড়ে ছোট ছেলেটি ক্লাশ টু'তে। এই ভাল না থাকার সময়েও টিউ নিজের স্কুল,নিজের স্ত্রী,সন্তান সবকিছু নিয়ে কিছুটা হলেও ভাল ছিল,কিন্তু টিউর সে সামান্য সুখটুকু দেখে বোধহয় তাও সৃষ্টিকর্তা সহ্য করতে পারলেন না। একটি জটিল সমস্যা পাঠিয়ে অবশিষ্ট থাকা যা সুখ তা মুহূর্তে কেড়ে নিলেন নির্দয় ভাবে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত্ম নগরের মত টিউ পুরো বিধ্বস্ত্ম হয়ে পড়ল এ জটিল সমস্যার কারণে। সমস্যার শুরু এক মাস আগে যখন টিউর বড় মেয়ের ফুসফুসে ছোট একটি সমস্যা ধরা পড়ে। তার মেয়ে এ রোগটি লালন করছিল অনেক দিন আগে থেকে। কিন্তু তারা স্বামী স্ত্রী কেউ তা জানতো না। তাদের লাজুক সরল মেধাবী মেয়েটি তার এ বুকের ব্যাথাটি অনেক দিন চেপে রেখেছিল স্বগোপনে। তারা তখনি জানতে পারে যখন মেয়েটি স্কুলে ক্লাশ করতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পর দিনই টিউ মেয়েকে থানা সদরের পিঁপড়া ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। থানা সদরের পিঁপড়া ডাক্তার লক্ষণ শুনে শহরের বড় হার্টের পিঁপড়া ডাক্তার দেখাতে বলে। এবং সে সেখানেও নিয়ে যায়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হার্টের পিঁপড়া ডাক্তার জানায় মেয়ের ফুসফুসে একটি টিউমার বেড়ে উঠেছে এবং তা যতা শীঘ্রই সম্ভব অপারেশন করা দরকার তা না হলে যে কোন সময় কিছু একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। আর অপারেশনের জন্য দরকার অনেক খাদ্য শস্য। যা তার একেবারেই সামর্থ্যর বাইরে। টিউ একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ে, কোথায় পাবে সে এত খাদ্য শস্য। স্কুল কমিটি থেকে যে খাদ্য শস্য দেওয়া হয় তা দিয়ে তার সংসারে টানা-পোড়েন অবস্থা,তাহলে ? স্থানীয় একটি ছাত্র সংগঠন তার মেয়ের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চাঁদা তোলার জন্য তার কাছে আসে। সে সম্মতি দেয় নি কারণ সে নিজেকে ভিখারীর পর্যায়ে নামাতে চায়না। তাছাড়া এতগুলো রাজনৈতিক দলকে আর ধর্মীয় নেতাদের চাঁদা দিতে দিতে সাধারণ পিঁপড়েরা যেভাবে নিষ্পেষিত নিজের সন্তানের জন্য তাদের কাছে গিয়ে হাত পাঠতে তার কেমন জানি সংকোচ হল।

টিউদের আদি নিবাস অঙ শহর এলাকায়। সেখানে তাদের কিছু সম্পত্তি আছে, তার বাবা-মা অনেক আগে গত হয়েছেন। তাদের সে সব সম্পত্তি একমাত্র বড় ভাই দেখাশোনা করেন। টিউ রাজনীতি করলেও বড় ভাই সে পথে কখনো পা বাড়ায়নি কিন্তু টিউ শুনেছে তার বড়ভাই বর্তমানে শাসক গোষ্টির রাজনীতি করে বড় নেতা বনে গেছে। টিউ এখন কোথয় আছে, কি করে,বেঁচে আছে না মরে গেছে তার ভাই জানে না। কারণ সে নির্বাসন নিয়েছিল অভিমান করে, কাউকে না জানিয়ে। টিউ সিদ্ধান্ত্ব নেয় বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে নিজের ভাগের সম্পত্তি চাইবে। কিন্তু এত বছর পর তার ভাই কি তাকে সম্পত্তির ভাগ দেবে ? বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে তারও অধিকার আছে। তাছাড়া সেতো এমনি চাইতে যাচ্ছে না, বিপদে পড়েই যাচ্ছে। মনের সাথে কয়েকদিন যুদ্ধ করার পর একদিন স্কুল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে টিউ দ্বিধান্বিত,দ্বৈত মন নিয়ে অঙ শহরে সম্পত্তি চাইতে ভাইয়ের কাছে যায়। তার সাথে যায় এক মাত্র শালা বকু। শহরে পৌছানোর পর টিউ লক্ষ্য করে তাদের শহরটি অনেক বদলে গেছে। এত দোকান-পাট,এত বড় বড় দালান কোটা তার সময়ে ছিল না। রাস্ত্মাঘাটও অনেক উন্নতি হয়েছে। বুঝায় যাচ্ছে শহরে পুঁজিপতির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গ্রামের উৎপাদিত সকল খাদ্য শস্য শহরে পুঁজিপুতিদের কাছে এসে জমা হচ্ছে। এ সব অট্টালিকা কাকে শোষণ করে গড়ে উঠছে তা বদ্ধ উলঙ্গ ভাবে বুঝা যায়। সদ্য দাড়ি-গোঁফ গজানো বকু আগে কখনো শহর দেখে নি সে জন্য বিস্ময় ভাবটা ছিল তারই বেশি। বড় বড় অট্টালিকা,তার সমবয়সি ছেলে মেয়েদের অদ্ভূত সুন্দর বেশ-ভূষা দেখে সে বারে বারে অবাক হচ্ছিল এবং সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না তার বোন জামাই কেন এত সুন্দর শহর ছেড়ে ওরকম অজপাড়া গায়ে মরতে গেল! টিউ বড় ভাইকে দেখেও বুঝতে পারল বড়ভাইয়ের অনেক পুঁজি-পতি বেড়েছে। তাদের সেই পুরনো জীর্ণ বাসাটি ভেঙে নতুন সুন্দরও একটি বাসা তৈরী করেছে। প্রথমে সে তাদের বাসাটি চিনতেই পারে নি। পাড়ার পিঁপড়াদের কাছে জিজ্ঞেস করে সে বাসাটি খুঁজে পায়। টিউর বড় ভাই এত বছর পর ছোট ভাইকে দেখে খুব বেশি খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। টিউ ভেবেছিল এত বছর পর ভাই তাকে দেখে খুশিতে উচ্ছাসিত হবে। কিন্তু বড় ভাইয়ের কিরকম যেন নিরুত্তাপ ভাব। যেন গতকালই তার সাথে দেখা হয়েছে এমন ভাবে সে তার খোঁজ খবর নিল, এতদিন সে কোথায় ছিল,এখন সে কি করে এই সব। ভাইয়ের স্বচ্ছলতা দেখে টিউ বুঝতে পেরেছিল বড়ভাই বদলে গেছে কিন্তু এতটা পরিবর্তন সে আশা করে নি। ভাইয়ের এ রকম আচরণে টিউ অরো বেশি নিজেকে বিপন্ন বোধ করে। আপন ভাইকে নিজের সমস্যা ও সম্পত্তির কথা বলতে কেমন জানি সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু বড় ভাই নিজেই সে কথা তাকে জিজ্ঞেস করে,"সে সম্পত্তির জন্য এসেছে কিনা ?" টিউ ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে বুঝতে পারে না ,তাই সে চুপ করে থাকে। টিউর নীরবতা দেখে বড় ভাই সম্ভবত বুঝতে পারে, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। বড় ভাই আবার শুরু করে-

"দেখ টিউ তুমি জানই বাবা মায়ের সম্পত্তি বলতে যা ছিল, তা খুবই সামান্য। সেই সামান্য সম্পত্তিটুকু কাজে লাগিয়ে অনেক কষ্টে পরিশ্রম করে আমি বর্তমানে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছি এবং তোমার লেখাপড়ার পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছি। ভেবে ছিলাম তুমি লেখাপড়া করে পিঁপড়ার মত পিঁপড়া হয়ে, অনেক বড় চাকরী করবে। তোমার বাবা মায়ের কোন সম্পত্তি প্রয়োজন পরবে না। যাক যখন তুমি সম্পত্তির জন্য এসেছ, তোমাকে আমি ফিরাব না। বাবা-মায়ের সম্পত্তি বেঁচে যে শস্য তুমি পাবে তার সম পরিমাণ শস্য তোমাকে আমি দেব। কিন্তু আমার কষ্টে অর্জিত সম্পত্তি থেকে তোমাকে কোন ভাগ আমি দিতে পারব না"

একদিন যার বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে হাজারো পিঁপড়া উদ্ধেলিত হত,শাসক গোষ্টি ভয়ে কেঁপে উঠতো, সে কণ্ঠে আজ নিজের ভাইয়ের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলতে কেন জানি সংকোচ হল টিউর। সে বলতে পারল না ভোগের জন্য সে ভাইয়ের কাছে সম্পত্তি চাইতে আসে নি, এসেছে নিজের মেয়ের প্রাণ বাঁচাতে। দারিদ্র সবাইকে আত্মবিশ্বাস হীন করে। তাই বলে নিজের ভাইকে নিজের সমস্যার কথা বলতে কেন এতটা সংকোচ। বলতে পারল না টিউ,শুধু বলল-"আচ্ছা ঠিক আছে, ভাই"

পরদিনই টিউ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ভাইয়ের কাছ থেকে শস্য নিয়ে। আসার পথে শহরে অনেক দিন পর অনেক পরিচিত পিঁপড়ার সাথে দেখা হল। দেখা হল পরিচিত অনেক নেতার সাথে। এখনো তারা রাজনীতির সাথে যুক্ত এবং অনেক বড় বড় নেতা। দল যখন অবিভক্ত ছিল, এ পিঁপড়া নেতাগুলো ছিল সাধারণ কর্মী সে ছিল তাদের নেতা। কুশল বিনিময়ের পর আলোচনার এক ফাঁকে এ পিঁপড়া নেতারা বুঝিয়ে দেয় তারা এখন অনেক পয়সার মালিক। বেশ ভূষায়, হাব ভাবে তা ভালোই বুঝা যাচ্ছিল যে এখন তারা পুঁজি-পতি। এবং সবাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটি কথা বার বার তারা বুঝিয়ে দিল,যদি কখনো দলের সাহায্য প্রয়োজন হয় সে সাহায্য চাইতে পারে। তাদের এ সব কথায় টিউ অসহায় বোধ করে। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। বুঝতে পারে সে এখন সবার করুণার পাত্র। তার ভাই না বলতেই বুঝে গেল কেন সে এখানে এসেছে। তাহলে কি নিজের অজান্তে্ব সে ব্যবহারে আচরণে নিজের দৈন্যতাকে প্রকাশ করছে ? কিন্ত্ব সে তো কখনোই মনে দরিদ্র ছিল না। সে জানে দারিদ্র্য লজ্জার নয়, কিন্তু স্বার্থের জন্য দারিদ্র্যতাকে প্রকাশ করাই মনের দৈন্যতা। কিন্তু সে তো নিজের স্বার্থের জন্য আজ এভাবে শহরে আসে নি এবং করুণা চাইতে ও নয়। তাই সে নেতাদের করুণা ভরা সাহায্যের হাত দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখান করে। লক্ষ পিঁপড়ার শোষণ বঞ্চনার রক্তের উপর হেঁটে নিজের মেয়ের প্রাণ সে বাঁচাতে চায় না। যে সাহায্য তারা তাকে দিতে চায়, তা তো লক্ষ পিঁপড়েরই রক্ত।

দুই

পিঁপড়ী কাজ থেকে ফিরে দেখল তার স্বামী টিউ বাসার সামনের দরজায় বসে তামাক খাচ্ছে। তার চার পাশ তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার। মুখ দেখে পিঁপড়ী বুঝতে পারে তার স্বামী রাগে অপমানে গুম হয়ে বসে আছে। পিঁপড়ী স্বামীকে না ঘাটিয়ে নিরবে বাসার কাজ শুরু করে দেয়। সে বুঝতে পারে তার স্বামী কেন এত রেগে আছে। আজ সকাল বেলা সে যখন সে কাজে যাচ্ছিল তখন দুটি পিঁপড়া ছেলে তার স্বামীর কাছে এসেছিল। কেন এসেছিল তা স্পষ্ট, দলের চাঁদা চাইতে। মেয়ের অসুখের কারণে এ বছরের কোন দলকে তারা চাঁদা দিতে পারছে না। মেয়ের পিছনে জলের মত শস্য খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরা কি এসব বুঝে না ? তাদের কি ন্যূনতম বিবেকটুকু নেই ? পিঁপড়ীর মনে অভিমান এসে জমা হয়। এবং তা তার আদর্শবান স্বামীর উপর। কবেই মেয়ের চিকিৎসার শস্য যোগার হত। সে যদি এত আদর্শ আত্মসম্মান নিয়ে না থাকত। গ্রামের লোকজন আন্তরিক ভাবে তাকে সাহায্য করতে চায় সাহায্য সে নেয় নি,ছাত্র সংগঠনের সহযোগীতা ফিরিয়ে দিল, কোন দল সাহায্য করতে চাইলে প্রত্যাখান করে। মেয়ে যদি নাই বাঁচাতে পারে কি করবে সে এত নীতি আদর্শ,আত্মসম্মান নিয়ে ?

হা টিউ বিরক্ত এবং রেগে ছিল তবে তা কারোর উপর নয় নিজের উপর। আজ সকাল বেলা দুটি পিঁপড়া ছেলে এসেছিল তার কাছে চাঁদা চাইতে। কত আর বয়স হবে পিঁপড়া ছেলে দুটির, বড় জোর একদিন। ডিমের খোলস ভেঙে বেড়িয়ে আসা এ পিঁপড়ে দুটোর মাথায় এখনো তার দাগ লেগে আছে। অথচ তারাই তাকে শাসিয়ে গেল এক সপ্তার ভিতর চাঁদা দিতে না পারলে খবর আছে। ছেলে দুটোর কথায় কোন প্রতিবাদ করল না টিউ শুধু শুনে গেল। পিঁপড়া ছেলে দুটো চলে যাবার পর হঠাৎ তার মনে হল, সে কি সেই টিউ যে ছিল এক সময়ের অসম্ভব মেধাবী ছাত্র নেতা, রাজপথ দাপিয়ে বেড়াত। যার হাতে এক সময় গর্জে উঠেছিল মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্র ! দলের প্রতিটি কর্মী যার ভয়ে সদা ততস্থ হয়ে থাকত এবং উপরস্থ থাকা নেতারাও পর্যন্ত যাকে সমীহ করত । এই কি সেই টিউ ? তাকে কিনা একদিনের পিঁপড়া ছেলেরা শাসিয়ে যায়। কেন সে এতদিন এত বছর এভাবে কাপুরুষের মত পড়ে আছে। প্রচন্ড রাগ হল তার নিজের উপর। না এভাবে আর নয়। তাকে ঝেড়ে উঠতেই হবে। সব সংকোচ, দ্বিধা দ্বন্ধ ঝেড়ে ফেলে নিজের জন্য, নিজের মেয়ের জন্য এবং সমগ্র পিঁপড়া জাতির জন্য কিছু একটা করতে হবে। কাপুরুষের মত পালিয়ে না থেকে মাথা উচুঁ করে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। সে তো নিজেই হতে পারে স্বপ্নের সেই নেতা, সেই নেতৃত্ব, যার নেতৃত্বে সকল পিঁপড়া জাতি এক হয়ে সকল অপশক্তি, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। আজ টিউ সারাদিন বাসা ছেড়ে কোথাও যাই নি। সারাদিন নিজেকে ভেঙে ভেঙে তৈরী করেছে ভিন্ন ভাবে। নির্বাসিত জীবন আর নয়।

তাকে অবশ্যই শহরে যেতে হবে। সব কিছু শুরু করতে হবে নতুন ভাবে। সেদিন থেকে টিউ নিজেকে পুরো বদলে ফেলে এবং কয়েকদিনের ভিতর টিউ শহরে গিয়ে তার সব পুরনো সমপন্থী বন্ধুদের খুঁজে যোগাযোগ শুরু করে। সমাজের অন্তরালে অভিমানে লুকিয়ে থাকা বুদ্ধিজীবিদের উজ্জীবিত করে। তার ইচ্ছের কথা সে সবাইকে খুলে বলে। রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করে নয়,সহিংস ভাবে নয়, কাউকে শোষণ করেও নয়। তাদের অন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে ভিন্ন ভাবে। অহিংস ভাবে, নিজেদের মেধা দিয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শক্তি দিয়ে। জাতির এ ক্রান্তিকালে জাতির জন্য একটি যোগ্য নেতৃত্বের খুব প্রয়োজন।

বন্ধদের সহযোগিতায় শহরে তার একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতার চাকরী হয়ে যায় টিউর এবং তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য শস্য ধার দেয়। অপারেশনের সব কিছু বন্দোবস্ত করে। টিউ বুঝতে পারে আন্দোলনের জন্য আগে নিজের ভিত তৈরী করতে হবে এবং তার জন্য পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন।

শহরে যাবার এবং মেয়ের চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে টিউ গ্রামে চলে আসে এবং স্ত্রীকে সব খুলে বলে। টিউর এ পরিবর্তনে তার স্ত্রী বিস্মিত এবং খুশি হয়। এতদিন যেন টিউ ঘুমিয়ে ছিল, কিছুক্ষণ আগে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেছে। গ্রামের পিঁপড়েরা কিভাবে জানি জেনে যায় টিউ গ্রামে থাকছে না শহরে চলে যাবে। গ্রামের সব পিঁপড়া এবং তার ছাত্ররা এসে তার বাসার সামনে ভিড় করে, তারা টিউকে ছাড়তে চায় না। টিউ অবাক হয়। এদের মনে তার জন্য এতটুকু ভালবাসা জমা হয়েছে সে কখনোই জানতে পারে নি। টিউ তাদের বুঝায় তাকে যেতেই হবে পিঁপড়া জাতির জন্য, নিজের মেয়ের প্রাণের জন্য এবং অনেক কিছু বলে সে তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে। পিঁপড়েরা তার কথা মেনে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু শহরে যাবার এক দিনের আগের রাতে মেয়ের বুকের ব্যাথাটা প্রচন্ড ভাবে শুরু হয়। টিউ দিশাহারা হয়ে পড়ে। এত রাতে কিভাবে টিউ মেয়েকে থানা সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাবে ? এই গ্রাম থেকে থানা সদর পনের মাইল দূরে। এ গ্রাম থেকে থানা সদরে যান বাহনের যাবার কোন স্থল পথ নেই। একমাত্র পথ হল পানি পথে পিঁপড়েদের তৈরী পাতানৌকায় আসা যাওয়া করা। হাঁটা পথ থাকলেও এতরাতে এতদূর পথ হেঁটে যাাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তার পরও টিউ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, মেয়েকে যেভাবেই হোক হাসপাতালে নিতেই হবে। কিছুতেই হেরে গেলে চলবে না। পাতানৌকায় করে বৈঠা বেয়ে হলেও নিতে হবে। টিউ আর তার স্ত্রী নিয়ে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য মেয়েকে পাতানৌকায় উঠাল। তারা যখন রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন দেখতে পেল রাতের অন্ধকার চিড়ে শত শত অলোর মশাল তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা দুজনই হতভম্ব হয়ে গেল বুঝতে পারল না কি হতে চলেছে। তারা এতটা বিস্মিত হয়ে

গেল যে বৈঠা বাইতে ভুলে গেল। আলোর মশাল গুলো কাছে আসলে তারা বুঝতে পারল গ্রামের সব পিঁপড়ে কিভাবে জানি তাদের থানা সদরে যাবার খবর পেয়ে শত শত নৌকা নিয়ে চলে এসেছে। সবাই তাদের সাথে থানা সদরের হাসপাতালে যেতে চায়। টিউ মনে মনে খুশিই হল কারণ এতদূর পথ বৈঠা বেয়ে থানা সদর হাসপাতালে পৌঁছানো তাদের দুজনের পক্ষে খুবই কষ্টের হত। সে মনে মনে গ্রামবাসির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল। তারপর ভেবে দেখল এত পিঁপড়ের যাবার কোন প্রয়োজন নেই। টিউ তাদের সাথে ছয়-সাত জন জোয়ান পিঁপড়েকে থেকে গিয়ে,অন্য সবাইকে সে ফিরে যেতে বলল। তার এ কথায় সবাই প্রতিবাদ করে উঠল। তারা সবাই সাথে যাবার জন্য এসেছে ফিরে যাবার জন্য নয়। তার মেয়ের ভাল মন্দ দেখার অধিকার তাদেরও আছে। টিউ তাদের কথা মেনে নিল। তারা যখন রওনা দিল, টিউ দেখল রাতের অন্ধকারে শত শত আলোর মশাল নিয়ে শত শত পাতানৌকার মিছিল নদীর বুক চিড়ে এগিয়ে চলেছে নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। টিউর হঠাৎ করে কি জানি কি হল। রাতের অন্ধকারে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। সে জানে এ জল কষ্টের বা ভয়ে নয়,এ জল গড়াল খুশিতে,এক অনন্য ভালবাসা পাবার আনন্দে। এত ভালবাসার ঋণ সে কিভাবে শোধ করবে। হ্যাঁ,এ ঋণ শোধ করতেই হবে তাকে। সকল অপশক্তির কাছ থেকে জাতিকে শোষণ বঞ্চনা মুক্ত করে, প্রতি ঘরে ঘরে এ আলোর মশাল পৌঁছে দিয়ে সে তার ঋণ শোধ করবে এবং তা সে করবে কোন দলীয় ভাবে নয়,সহিংস ভাবে নয়, কাউকে শোষণ করেও নয় । তাকে করতে হবে তাদের এই ভালবাসার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। কারণ ভালবাসার শক্তির চেয়ে আর কোন কিছুই বড় নয়।

.....

** নয়ন জ্যোতি চাকমা, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী, দিঘীনালা।*

মনোজ বাহাদুর

ভুল

জীবনের অনেক চড়াই উৎরাই পেড়িয়ে আমরা আমাদের কাঙ্খিত গন্তব্যে বা তার কাছাকাছি নিজেদের নিয়ে যেতে পেরেছি। হয়তো অনেকে পা পিছলে জীবন পথের কোন কঠিন বাঁকে মুখ থুবরে পড়ে থেকেছি। এই হলো জীবন। কৈশোর পেড়িয়ে একটি সময় আসে যখন আমরা সকলে স্বপ্ন দেখি। আমাদের চোখের সামনে নূতন নূতন দিগন্তের পর্দা উন্মোচিত হয়। আমরা পূলকিত হই। নূতনের প্রতি আমরা আকর্ষন অনুভব করি। ভালো মন্দ অভিজ্ঞতা না থাকার কারনে আমরা বুঝতে পারি না কোনটা সঠিক। অনেকে উন্মাদনার বশে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হই। কেউ কেউ অত্যাধিক আবেগের কারনে জীবনের ভুল পথে পা বাড়াই। তবে যারা জীবনের শুরুতে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে নিজেদের গড়ে তুলেছেন,তারা কিছুটা ভিন্ন। তারা নিজেদের জন্য বেছে নিতে পেরেছেন সঠিক পথ। এসবের ব্যতিক্রম যে নেই তা আমি অস্বীকার করি না। সব কিছুরই ব্যতিক্রম বিদ্যমান।

আমার গল্পটি আসলে কলেজ পড়ুয়া উঠতি বয়সের মেয়েদের স্বপ্ন দেখার কাহিনী। ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী রয়েছে। আমার গল্পের নায়িকা দুইজন। একজন জয়া আর অন্যজন মৌমিতা।

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মৌমিতা। রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজে দ্বাদশ শ্রেনীতে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। বাবা নেই। মা আছেন,তবে অসুস্থ। সকাল থেকে তার ব্যস্তবতার অন্ত নেই। ঘুম থেকে জাগার পর ঘর ঝাড়া, রান্নাঘর সামলানো,রুগ্ন মার সেবা যত্ন সবই তাকে করতে হয়। সময় যুগিয়ে একফাঁকে সে প্রর্থনার কাজটিও নিয়মিত করে। ধর্ম কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার ছোট বেলা থেকেই। ছোট ভাই শান্তনু তার থেকে বছর দুয়েকের ছোট। শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে দশম শ্রেনীতে পড়ে। তার দ্বায়িত্ব ও কম নয়। সকালে উঠে বাজার করা,মায়ের জন্য ঔষধ আনা, কাপড় ধোয়া,কাপড় শুকানো, ইত্যাদি কাজের পর নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি। বাপ মরা এ দুই ভাই বোনের মধ্যে সমঝোতাটা বেশ। এই দুই ভাই বোনের পড়া লেখা চলছে এক কঠিন বাস্তবতায়। এমন বাস্তবতায় কোন এক সকালে-

মৌমিতা-মা,আমি কলেজে যাচ্ছি।

মা-আয় মা।

মৌমিতা-শান্তনু, টেবিলে নাস্তা আছে,খেয়ে নিস।

শান্তনু-দিদি, আমার স্কুলের ফি জমা দিতে হবে।

মৌমিতা-সামনের মাসে দিস,এ মাসের বাজারের টাকাটাই কুলোয় কিনা ভাবছি।

শান্তনু-ঠিক আছে।

মৌমিতা প্রতিদিনের মত রাস্তায় এসে দ্বাড়ায় কলেজ বাসের জন্য। কলেজের বাস একটি। তাই ছাত্র ছাত্রীদের আসন সংকুলান হয় না। ঠেলাঠেলি করে, অনেকে দাঁড়িয়ে বাদুর ঝোলা হয়ে বাসে চড়তে হয়। জয়া মৌমিতার সাথে একই ক্লাসে পড়ে। জয়া মৌমিতার খুব ভাব। একে অন্যকে না দেখে থাকতে পারে না। জয়ার পারিবারিক অবস্থা ভালো। তার বাবা ব্যবসা করেন। মা সুতপা দেবী জয়াকে একটু বেশীই আদর যত্ন করেন। তার সকল বায়না ও আবদার পূরণে তিনি বাবা হিরন্ময় দে কে সুপারিশ করে থাকেন। বাবা হিরন্ময় দে মেয়ের অপ্রয়োজনীয় আবদার পূরণে সবসময় রাজী হন না। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুইজনের মধ্যে প্রায় সময় কথা কাটাকাটি হয়। হিরন্ময় বাবু মাঝে মাঝে রাগ করে বলে থাকেন, জয়ার জীবনটা যদি নষ্ট হয়, তবে এজন্য তুমিই দায়ী থাকবে। এত আদর ভালো নয়। মা সুতপা দেবী কিছু না বলে চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে মা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে এই কথায় বলেন, আমার জয়া মার কপালে যা থাকে তাই হবে,আমরা কোন অন্যায় কিছু করছি না ধর্ম কর্ম করছি আমাদের মেয়ের জীবন নষ্ট হতে যাবে কেন ? হিরন্ময় দে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন-হে ভগবান তাই যেন হয়।

কলেজ বাস আসলে মৌমিতা বাসে উঠে পড়ে। জয়া মৌমিতার আগে বাসে ওঠে। তাই প্রতিদিনই সে মৌমিতার জন্য তার পাশের সীট টি খালি রাখে সে খানে কাউকে বসতে দেয় না। এ নিয়ে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যারা বাসে আগে ওঠে ও সীট পায় না,তারা প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও সেটি ধনী ঘরের মেয়ে জয়া কানে তোলে না। তা ছাড়া কলেজের হিরো ধনী ঘরের সন্তান প্রতাপশালী ছাত্র নেতা অভিজিতের সাথে মৌমিতার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণেও অন্যরা এ বিষয়ে কিছু বলতে সাহস পায় না।

জয়া-মৌমিতা আয় তোর জন্য জায়গা রেখেছি।

মৌমিতা-থ্যাংকস।

কলেজ ক্যাম্পাসে বাস থামে,মৌমিতা আর জয়া বাস থেকে নেমে হাঁটতে থাকে-

জয়া-মৌমিতা,তোকে একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। মান্নান স্যার তোকে খুঁজছিল।

মৌমিতা-কেন?

জয়া-আগামী সোমবারে কলেজে নবীন বরন অনুষ্ঠানে তোকে গান গাইতে হবে।

মৌমিতা-আমাদের মত যারা, তাদের কাছে গান বল আর কবিতা বল সবই অর্থহীন। কলেজের পড়া শিখার সময় পাই না তা আবার গান। তার উপর আবার হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেই মায়ের গালাগালি।

জয়া-শোন মৌমিতা, আমাদের কারোর জীবনই পারফেক্ট নয়। সমস্যা,কষ্ট, বেদনা, সকলেরই রয়েছে। তোরটা একরকম আর আমারটা এক রকম। যাক সেসব কথা। তুই মান্নান স্যারের সাথে দেখা করিস। আমি একটু অভিজিৎকে চেহারাটা দেখিয়ে আসি।

অভিজিৎ ধনী বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবার কাঠের ব্যবসা রয়েছে। তা ছাড়া শহরে তাদের হোটেল ব্যবসাটা অভিজিত নিজে দেখাশোনা করে। অন্যান্য ধনী বাবার সন্তানেরা যেমন হয়ে থাকে,অভিজিত তাদের চাইতে একটু ভিন্ন। তার স্বভাব চরিত্র ভালো, জীবনের প্রতি তার ভালোবাসা রয়েছে। বাবা মার যোগ্য সন্তান হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সকল প্রচেষ্টা তার মধ্যে বিদ্যমান। সংস্কৃতির প্রতি তার দূর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে গীটার বাজিয়ে গান করে সে। তবে গানের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত যে প্রতিভার দরকার সেটি তার মধ্যে যথেষ্ট নয়। তবে কলেজের অনুষ্ঠান গুলোতে তার সংশ্লিষ্টতা ও আন্তরিকতাই প্রমাণ করে সে একজন সংস্কৃতি প্রেমী।

মৌমিতা ভালো গান করে। অভিজিত সেটি জানে। তবে মৌমিতার সাথে তার কোন আলাপ নেই। সেটি জয়ার ভয়ে। তবে জয়ার মাধ্যমে অভিজিত মৌমিতার সব খবরই পেয়ে থাকে। জয়া অনেকটা অযাচিত ভাবেই অভিজিতকে নানান কথা বলে থাকে। সেই কথার মধ্যে মৌমিতার প্রসঙ্গ ও চলে আসে। এমন হয়, যখন দুই প্রেমিক মনের মিলনে সব কথা ফুরিয়ে যায় বা যখন বলার মত কোন বিষয় মনে আসে না বলে। অভিজিত জয়াকে ভালোবাসে। জয়াও অভিজিতকে ভালোবাসে। তবে কার ভালোবাসা কতটুকু সেটি বোঝা মুশকিল। অভিজিত জানে জয়া ভারী সেন্টিমেন্টাল। তাই সে তার সাথে কথা বলার সময় খুব সাবধান থাকে। কথা বলতে বলতে মতের মিল না হলে বা তার মতের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করলে আর রক্ষা থাকে না। জয়া ভয়ানক চটে যায় ও সিনক্রিয়েট করে। মাঝে মাঝে বই পত্র ছুঁড়ে ফেলে হন হন করে হেঁটে চলে যায়। কারো কোন কথাই সে আর মানে না। তার পর তার মোবাইল বন্ধ, সাথে ২/৩ দিন কলেজে আসা বন্ধ।

এমন ঘটনা নুতন নয়। তাই জয়াকে নিয়ে মৌমিতা সব সময় সতর্ক থাকে।

মৌমিতা-এই জয়া আজকে আবার কোন ঝামেলা বাধাস নে।

জয়া-ঝামেলা হলে বা কি ? তুই আছিস না ?

যখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটে,তখনই মৌমিতার ডাক পড়ে। মৌমিতা জয়ার বাসায় গিয়ে তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে শান্ত করে। এজন্য জয়ার মা সুতপা দেবী মৌমিতাকে খুব স্নেহ করেন।

মৌমিতা এসব ভাবতে ভাবতে মান্নান স্যারের অফিস কক্ষে এসে হাজির।

মৌমিতা-আসতে পারি স্যার?

মান্নান স্যার-কে,ভেতরে এসো। ও মৌমিতা। তোমাকেই খুঁজছিলাম। আগামী সোমবারে কলেজের নবীন বরন অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে হবে।

মৌমিতা-স্যার,অনেকদিন গানের চর্চা করতে পারি নি। গাইতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না স্যার।

মান্নান স্যার-এখনো ৩/৪ দিন সময় আছে। প্রাকটিস করে নিও।
মৌমিতা-আচ্ছা স্যার।
মৌমিতা কিছুতেই মান্নান স্যারকে না করতে পারলো না। মৌমিতা নিজেও জানে সে ভালো গান করে। শ্রোতাদের আগ্রহ তাকে উৎসাহিত করে। সে জন্মগত ভাবে সঙ্গীতের প্রতিভাধারী। তার মধ্যে একটি শিল্পী মনের বসবাস,তাই গানের টানটা সে সব সময় অনুভব করে। কিন্তু কঠিন বাস্তবতার কারনে তার গান শেখা বা চর্চাটা হয়ে ওঠছে না। এজন্য তার ভাগ্যটাকে সে ধিক্কার দিয়েছে বার বার। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন গানের সুযোগ আসে তখন মনটা বেশ ফুরফুরে লাগে।
গানের কথা আসলেই তার মনে পড়ে তার স্বর্গীয় পিতা সদানন্দ সেনকে, যিনি তাকে খুব ছোট বেলা থেকে হাতে খড়ি করিয়েছেন গানে। ছোট বেলায় হারমোনিয়ামে গান শেখা তার বাবার মাধ্যমে। তার বাবা ছিলেন স্বনাম ধন্য গানের প্রশিক্ষক। তার গানের তরী থেমে গিয়েছে তার বাবার অকাল মৃত্যুতে। তাই বাবার কথা মনে এলেই মৌমিতার চোখদুটো ভিজে ওঠে। গানের মাধ্যমে সে তার বাবার স্মৃতিকে আকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু তার মা গান পছন্দ করেন না। মৌমিতা মাঝে মাঝে ভাবে কেন তার মা গান পছন্দ করেন না। তার সন্দেহ কাতর মনে নানান চিন্তা চলে আসে। ভাবে তবে কি তার বাবার কারনে? মৌমিতা শুনেছে যে,তার মা তার বাবাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো। তার বাবা দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। সে আরো শুনেছে যে তার মা ও একসময় ভালো গান গাইতেন। এ সব চিন্তা তার কাছে নূতন নয়। ছোট বেলা থেকে সে এসব সমীকরণের হিসেব কষে আসছে। কিন্তু কোন ভাবেই মিলাতে পারছে না। বাবাকে তার ঝাপসা মনে পড়ে। কারন তার ৪/৫ বছর বয়সে তার বাবা মারা যান বলে সে জেনেছে। কিন্তু তার বাবার অনেক জিনিষ পত্র এখনো বাসায় তার মা বেশ যত্ন করে সংরক্ষণ করছেন। তাই তার মনে নানান চিন্তা চলে আসে। তবে কি তার বাবা এখনো বেঁচে আছেন ? এবং অন্য কোথাও....।
মৌমিতার মামা সুদেব চক্রবর্তী চট্টগ্রামে থাকেন। তার স্বর্ণের ব্যবসা আছে। অবস্থা ভালো। মৌমিতা জানে তার বাবার অবর্তমানে তার মামাই তাদের আসল অভিভাবক। পরিবারের সকল খরচ পত্র,তাদের দুই ভাই বোনের লেখা পড়ার খরচ তার মামা দিয়ে থাকেন। তার মামা মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখে যান। মৌমিতার মামাতো ভাই অভিজিত চক্রবর্তী মৌমিতার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। সে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২য় বর্ষে পড়ে। অভিজিত চক্রবর্তী লেখা পড়ায় ভালো। তার মামার ইচ্ছে মৌমিতা ডাক্তার হবে। তাছাড়া তার মামার আরো কোন ইচ্ছে আছে কি না সেটি মৌমিতা জানে না। তবে অভিজিত ও মৌমিতা তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখেছে। কথাও হয়েছে। তবে কেউ বাড়তি কিছু দেখানোর সাহস করে নি।

ছয়

কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠান

ঘোষক-এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে দ্বাদশ শ্রেনীর ২য় বর্ষের ছাত্রী আমাদের সকলের পরিচিত মৌমিতা সেন।
মৌমিতা গান গাইবে–আকাশে আজ রঙের খেলা,মনে মেঘের মেলা, হারালো সুর হারালো গান,ফুরালো যে বেলা..
গান শেষ হলে দর্শকের তালি ও ওয়ান মোর-ওয়ান মোর-
অভিজিত-জয়া,তোমার বান্ধবীর গানের গলা তো বেশ। এত সুন্দর গাইতে পারে জানতাম না তো?
জয়া-আমার বান্ধবী বলে কথা। দেখতে কেমন তা তো বললে না।
অভিজিত-না-সে টা বলা যাবে না। আমি এত বোকা না যে তোমার কাছে অন্য কোন মেয়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করবো।
জয়া-আমার হিংসে হবে ভাবছো ?
অভিজিত-অবশ্যই। এ আবার নুতন কি ?
জয়া-না আমার হিংসে হবে না তুমি বল।
অভিজিত-সত্যি বলছো তো ?
জয়া-হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলছি।
অভিজিত--হুঁ--তোমার বান্ধবীর চেহারার সাথে সুচিত্রা সেনের বেশ মিল রয়েছে।
জয়া- তা হলে তো, তার জন্য একজন উত্তম কুমার খুঁজতে হয়।
অভিজিত-খুঁজতে হবে না, দেখো কাল থেকে তোমার বান্ধবীর পেছনে উত্তম কুমারদের লাইন লেগে গেছে।
জয়া-কি--লাইনে দাঁড়াবে না কি?
অভিজিত-এই মরেছে–আমি প্রথমেই বলেছিলাম তোমর হিংসে হবে। তোমরা না, আসলে আমি আস্ত একটা বোকা। নইলে তোমার ফাঁদে পা দিই কেন।
জয়া-না তুমি বোকা নও। তোমার মনের গোপন কথাটিই আমি জেনে নিলাম মাত্র। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।
অভিজিত-অনুষ্ঠান তো শেষ হয় নি যাচ্ছো কোথায় ?
জয়া চলে যাবে।

মৌমিতা জয়ার খুব কাছের বান্ধবী হলেও মৌমিতার ভালো রেজাল্ট, তার স্মার্টনেস, ভালো গান গাইতে পারা সর্বোপরি কলেজে নানান ক্ষেত্রে মৌমিতার উচ্চ স্থানে অবস্থানের বিষয়টি জয়ার কাছে সুখকর ছিল না। সে মৌমিতার প্রতি মনে মনে জেলাস ফিল করতো। কিন্তু কোন দিন সেটি তার চলনে বলনে কোন ভাবেই প্রকাশ করে নি। আজ যখন সে দেখলো যে তার একমাত্র প্রিয় মানুষটি মৌমিতার প্রশংসা করছে তখন তার মনের বন্যতা জেগে উঠলো। বাঁধ ভাঙা জোয়ারে সে লন্ড ভন্ড হয়ে গেলো। কিছুতেই সে নিজকে ধরে রাখতে

পারলো না।

অভিজিত আসলে এমন কিছু হবে ভাবেনি। সে স্বাভাবিক ভাবেই কথা গুলো বলেছে। কিন্তু সন্দেহ কাতর জয়া কোন ভাবেই অভিজিতের মুখে অন্য কোন মেয়ের প্রশংসা সহ্য করতে পারে নি। জয়া অভিজিতকে ভীষণ ভালোবাসে। তার ভালোবাসায় এক রকম বন্যতা রয়েছে। জয়া ভাবে অভিজিত শুধু মাত্র তার। সে কোন ভাবেই অভিজিতের মনে অন্য কোন মেয়ের প্রতি তার দূর্বলতাকে মেনে নিতে পারে নি। আর জয়ারই বা দোষ কি ? আজ পর্যন্ত্ব কেউ কি কারো ভালোবাসা কারো সাথে ভাগাভাগি করতে পেরেছে ? এই বাস্ত্মবতার কারনে জয়ার মনে এক প্রকার, মানসিক চাপ, হিংসে, অভিমান সহ এক প্রকার মানসিক বিকৃতির জন্ম নেয়। অভিজিতের প্রতি তার অভিমান, নিজের ব্যর্থতার জন্য রাগ,আর মৌমিতার প্রতি তার হিংসে এসব মিলিয়ে সে এক মানসিক বিকৃতিতে ভুগতে থাকে।

পরের দিন জয়ার ফোন বেজে উঠলো।

জয়া-হ্যালো,কে ? অভিজিত আমি এখন ব্যস্ত্ম আছি। তুমি পরে ফোন করো।

অভিজিত-আচ্ছা জয়া তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। গত রাত থেকে কতবার তোমায় ফোন করেছি জান ?

জয়া-আমার মন ভাল নেই।

অভিজিত-আচ্ছা,তুমি এমন ছেলে মানুষি করছো কেন ? তোমার বান্ধবী কি নাম জানি-

জয়া-মৌমিতা।

অভিজিত-ও হ্যাঁ মৌমিতা। সে যদি জানতে পারে যে তুমি তার প্রতি কতটা জেলাস,সে কি খুশী হবে।

জয়া-কি--তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছো ? ঠিক আছে আমি মৌমিতা কে বলবো-তোমার কথা।

অভিজিত-মানে, কি বলবে তুমি-।

জয়া-এই বলবো,তোমার দৃষ্টিতে মৌমিতা সুচিত্রা সেন। আর তুমি উত্তম কুমার হতে চাচ্ছো।

অভিজিত-জয়া, তুমি বিষয়টিকে এ ভাবে জটিল করে তুলছো কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

জয়া-আমার কিছু হয়নি। আমি ভালো আছি। রাখছি।

জয়া ফোনটা কেটে দিল। অভিজিত ভাবতে থাকে। জয়ার কথাটা তার কানে বার বার বাজতে থাকে,তোমার দৃষ্টিতে মৌমিতা সুচিত্রা সেন,আর তুমি উত্তম কুমার হতে চাচ্ছো-। অভিজিত এতদিন আসলে জয়াকে নিয়েই ব্যস্ত্ম ছিল। সে কখনো অন্য কোন মেয়ের বিষয়ে চিন্ত্মা কনে নি। আজ জয়ার এই কথায় তার মনে নূতন এক চিন্ত্মার জন্ম নিল। বার বার মৌমিতার কথা তার চিন্ত্মায় আসতে লাগলো। অভিজিত তুলনা করে দেখলো

সত্যিই তো, মৌমিতা আসলেই জয়ার চাইতে সুন্দরী, ফিগারটা ও বেশ, স্লিম,স্মার্ট, গানের গলা ভালো, লেখা পড়ায় ভালো। অভিজিতকে তার মনের গোপন ইচ্ছেটা বেশ নাড়া দিতে লাগলো। কিন্তু অভিজিত জানে না মৌমিতা কেমন মেয়ে।

পরের দিন,প্রতিদিনের মত মৌমিতা বাসে উঠে দেখলো যে,জয়ার পাশে অন্য একটি মেয়ে বসে আছে। স্বাভাবিক ভাবেই মৌমিতা জয়াকে জিজ্ঞেস করলো--

মৌমিতা-এই জয়া,কই আমার জন্য জায়গা রাখিস নি ?

জয়া-না ভাই,মনে ছিল না।

মৌমিতা-কি বললি,মনে ছিল না ?

জয়া-হ্যাঁ হ্যাঁ মনে ছিল না।

মৌমিতার কাছে জয়ার এই আচরণ মোটেই ভালো লাগলো না। তবে বুঝতে পারলো যে জয়ার কিছু একটা হয়েছে। সে বাসে আর কোন কথা বললো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদুর ঝোলা হয়ে বাস কলেজ ক্যাম্পাসে থামলো। বাস থামার সাথে সাথে জয়া বাস থেকে নেমে হন হন করে হেঁটে যেতে লাগলো। মৌমিতা জয়ার পিছু পিছু দৌড়াতে দৌড়াতে জয়াকে ডাকতে লাগলো--

মৌমিতা-এই জয়া, দাঁড়া না। কি হয়েছে তোর ? তুই আমার সাথে এমন করছিস কেন ?

জয়া-অভিজিত কে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

মৌমিতা-কি বললি ? অভিজিতকে জিজ্ঞেস করবো ? তা তোদের দুজনের মধ্যে আবার আমাকে জড়াচ্ছ কেন ?

জয়া-জড়াচ্ছি কোথায় ?

মৌমিতা-আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবো না। আমার কোন ভুল টুল হলে তুই আমায় ক্ষমা করে দিস। আমি ক্লাসে গেলাম।

জয়া কোন কথা না বলে চুপ করে তার গন্ত্মব্যে হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর জয়া মৌমিতার গমন পথে ফিরে তাকাতেই তাদের চোখা চোখি হলে জয়া চোখ নামিয়ে ফেললো।

জয়া ভাবতে লাগলো-সে যা করছে সেটি ঠিক নয়। জয়া সেটি জানে। কিন্তু সে কোন ভাবেই নিজকে ধরে রাখতে পারছে না। তার মনের সাথে তার বহুবার যুদ্ধ হয়েছে। গত রাতে সে এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে পারে নি। কিন্তু সে নিজকে শোধরাতে পারছে না। অন্য সময়ে জয়ার কোন সমস্যা হলে মৌমিতা এসে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বাভাবিক করেছে। কিন্তু এখন বিষয়টি অন্য রকম। জয়া মনে মনে মৌমিতার সাথে তার এমনতর আচরণের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে লাগলো। ভাবলো মৌমিতার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কিন্তু পরক্ষণেরই অভিজিতের কথাগুলো মনে এসে তাকে বেসামাল করে তুললো।

কলেজের একটু দূরত্বে রাঙামাটি কলেজের একটি ক্যান্টিন আছে। দুপুরের দিকে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা কলেজ ক্যান্টিনে গিয়ে এটা ওটা খেয়ে থাকে। প্রতিদিনের মত মৌমিতা

কলেজ ক্যান্টিনে বসে নাস্ত্মা খাচ্ছিলো। সে মুহূর্তে অভিজিত সামনে এলো--
অভিজিত-মৌমিতা,আমি অভিজিত,আমি কি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে পারবো ?
মৌমিতা-অবশ্যই,জয়ার বিষয়ে নিশ্চয় ?
অভিজিত-হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। সেদিন আপনার গান শুনে জয়ার কাছে আপনার একটু প্রশংসা করেছিলাম। অমনি সে যা তা বলা শুরু করেছে। আমার ফোন ধরছে না। আর আপনার সাথে আমাকে সন্দেহ করা শুরু করেছে। সে তো আপনার কাছের বান্ধবী,তাই আপনার সাহায্য চাইছি।
মৌমিতা-জয়া তো সকাল থেকে আমাকে এড়িয়ে চলছে। বাসে ও সে আমার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে নি। এখন বুঝতে পারছি-কেন ? আসলে জয়া একটা পাগল।
অভিজিত-পাগল নয় পাগলী।
মৌমিতা অভিজিত দুজনেই হেসে ওঠে।
মৌমিতা বাসায় গিয়ে জয়ার বিষয়টি ভাবতে থাকে। অভিজিতের কথা শুনে বুদ্ধিমতী মৌমিতার বুঝতে কষ্ট হয় নি যে,অভিজিতের মুখে তার প্রশংসার কারনেই জয়া এমনটি করছে। জয়ার জন্য মৌমিতার খুব কষ্ট হলো। সে বুঝতে পারলো যে জয়া তাকে জেলাস করে।
পরের দিন থেকে মৌমিতা খেয়াল করলো যে অভিজিত বার বার তার দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করছে। সে নানা অজুহাতে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে। মৌমিতার কাছে বিষয়টি ভালো ঠেকলো না। সে একবার ভাবলো, জয়াকে বিষয়টি জানানো প্রয়োজন। কিন্তু জয়ার সেদিনের আচরণের কথা মনে আসায়-সে আর সেটি করে নি। মৌমিতা এও ভাবলো যে হিতে বিপরীত কিছু যদি হয় ?
মৌমিতা লক্ষ্য করলো যে,২/৩ দিন জয়া কলেজে আসছে না। তাকে কলেজ বাসে দেখা যাচ্ছে না। সে একবার ভাবলো জয়ার বাসায় গিয়ে জয়াকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠিক করবে। কলেজ থেকে ফেরার পথে মৌমিতা জয়ার বাসায় গিয়ে হাজির। জয়ার মা সুতপা দেবী মৌমিতাকে বসিয়ে জয়াকে ডাকতে গেল। জয়া মৌমিতার আসার কথা শুনে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকলো। অনেক ডাকাডাকির পরও সে মৌমিতার সাথে দেখা করলো না। সুতপা দেবী মৌমিতাকে চা নাস্ত্মা খাইয়ে বিদেয় করলেন। মৌমিতা জয়ার এই আচরণে কিছুটা ক্ষিপ্ত হলো। সে নিজকে ভারি ছোট মনে করতে লাগলো। কি এমন হয়েছে যে জয়া তার সাথে একটু দেখা পর্যন্ত্ম করলো না ? এমন বান্ধবী না থাকলেই বা কি হয়।
পরের দিন কলেজে ক্লাস থেকে বেরিয়েই মৌমিতার সামনে হাজির অভিজিত।
অভিজিত-মৌমিতা, জয়ার খবর কি ? সে তো আমার ফোন ধরছে না। এই পাগলী কে নিয়ে যে কি করি ?
মৌমিতা-আমার বান্ধবীকে আপনি আর কখনো পাগলী বলবেন না।
অভিজিত-তবে কি পাগল বলবো ? আচ্ছা,আপনি তো এই সময়ে ক্যান্টিনে খেতে

যান,আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি ?
মৌমিতা-অবশ্যই,ক্যান্টিনটা তো সার্বজনীন। তবে আমাদের একসাথে দেখলে জয়ার মাথা আরো খারাপ হয়ে যাবে না তো ?
অভিজিত-সে যা ভাবছে,এমন কিছু কি হতে পারে না ?
মৌমিতা-আমার আসলে এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। আমি জানি না।
অভিজিত-সেদিন আপনার গান শুনে ----
মৌমিতা-অভিজিত বাবু আমার ক্লাসের সময় হয়েছে,আমি আসি।
এ ভাবে চলতে থাকে,জয়া আর মৌমিতার বন্ধুত্ব ভেঙে যায়। তারা অপরিচিতের মত একে অন্যকে এড়িয়ে চলতে থাকে। সময় গড়িয়ে চলে। জয়াকে অতীত ভেবে অভিজিত মৌমিতার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। মৌমিতা কিছুতেই অভিজিতকে কাছে আসতে দেয় না। মৌমিতা প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করে। ইতোমধ্যে মৌমিতার মা মারা যায়। মৌমিতা তার ছোট ভাইকে নিয়ে চট্টগ্রামে তার মামার বাড়ীতে চলে যায় ও মামার তত্ত্বাবধানে থেকে ডাক্তারী পাশ করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে যোগদান করে। ইতোমধ্যে মৌমিতার মামাতো ভাই অভিজিত চক্রবর্তী ডাক্তারী পাশ করে একই মেডিকেল কলেজে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ডাঃ মৌমিতা সেনের চেম্বার।
বেয়ারা-ম্যাডাম,রাঙ্গামাটি থেকে এক সিরিয়াস রোগী এসেছে, বড় স্যার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।
মৌমিতা-তুমি যাও আমি আসছি। মৌমিতা প্রফেসর চৌধুরীর চেম্বারে এসে- আমায় ডেকেছেন স্যার।
প্রফেসর চৌধুরী-হ্যাঁ, রাঙ্গামাটি থেকে একজন রোগী এসেছে, তুমি তো রাঙ্গামাটির মেয়ে। তাই তোমাকে এই রোগীর দায়িত্বটা দিতে চাচ্ছি।
মৌমিতা-ঠিক আছে স্যার, রোগী কত নম্বর কেবিনে স্যার?
প্রফেসর চৌধুরী-কেবিন নম্বর ৯।
মৌমিতা-ওকে স্যার। আমি যাচ্ছি।
মৌমিতা ৯ নম্বর কেবিনে এসে প্রবেশ করে।
সিস্টার-ম্যাডাম আসুন। রোগীর কন্ডিশন খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না।
মৌমিতা-আমি দেখছি।
রোগীকে দেখেই মৌমিতা চমকে ওঠে। রোগী আর কেউ নয় তার কলেজে জীবনের বান্ধবী জয়া। মৌমিতা রোগীকে পরীক্ষা করতে থাকে।
মৌমিতা-রোগীর সাথে কেউ এসেছে?
সিস্টার- হ্যাঁ, ম্যাডাম,
মৌমিতা-উনাদেরকে আমার চেম্বারে জরুরীভাবে দেখা করতে বলুন।

সুতপা দেবী-ভেতরে আসতে পারি?
মৌমিতা-আসুন।
সুতপা দেবী-আমি পেশেন্টের মা। আপনি আসতে বলেছিলেন।
মৌমিতা-আন্টি,বসুন,আপনি আমায় চিনতে পারেন নি,কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছি। আমি মৌমিতা, জয়ার বান্ধবী।
সুতপা দেবী-ও--হ্যাঁ,সেই যে মা তুমি এসেছিলে। কিন্তু জয়া তোমার সাথে দেখাটা পর্যন্ত্ব করে নি। জয়ার মুখে তোমার অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু মা কি হতে কি হয়ে গেলো। জয়া মা আমার কেন এমন হয়ে গেল আমি এখনো বুঝতে পারছি না।
মৌমিতা-আন্টি, জয়ার জরুরী অপারেশন দরকার। আপনাকে কিছু কাগজে সই করতে হবে।
সুতপা দেবী-মা, আমার জয়া বাঁচবে তো ? তার এই অবস্থার জন্য---
মৌমিতা-আন্টি এখন সে সব কথা থাক,আগে অপারেশনটা হয়ে যাক। ভয়ের কোন কারন নেই। আপনি টেনশন করবেন না।
ডাঃ মৌমিতা আর ডাঃ অভিজিত দুজনে মিলে জয়ার অপারেশনটা করলো।
মৌমিতা-আন্টি,অপারেশন ভালো হয়েছে,আর কোন ভয় নেই।
সুতপা দেবী-মা, তুমি না থাকলে যে কি হতো,আমি ভাবতেও পারছি না।
মৌমিতা-কিছু ক্ষণের মধ্যে জয়ার জ্ঞান ফিরবে,আপনি কাছে থাকলে ভালো হবে।
সুতপা দেবী-তুমি থাকবে না মা ? তোমাকে দেখলে জয়া খুব খুশী হবে।
মৌমিতা-আন্টি,এখন জয়াকে আমার বিষয়ে কোন কথা বলবেন না। সামান্য উত্তেজনাও তার জন্য ঠিক হবে না এখন।
সুতপা দেবী-আচ্ছা মা।
জয়া এখন খানিকটা সুস্থ, কিন্তু মৌমিতা তার সাথে এখনো দেখা করে নি। আর তার মাও তাকে কিছু বলে নি।
মৌমিতার অফিস চেম্বার
মৌমিতা-আচ্ছা আন্টি,জয়ার এই অবস্থা কি করে হলো ?
সুতপা দেবী-আমি যতটা শুনেছি তা হলো,কলেজে পড়ার সময় জয়ার সাথে একটি ছেলের সম্পর্ক হয়। পরে কি ভাবে কি জানি তাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে জয়া মন মরা হয়ে পড়ে। তার চলন বলন সব কিছু বদলে যায়। মাঝে শুনতে পেলাম যে সেই ছেলের সাথে নাকি জয়ার কোন বান্ধবীর বিয়ে হতে যাচ্ছে,এই খবরটা পাওয়ার পর থেকে জয়ার অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। গত সপ্তাহে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে রাঙ্গামাটি হাসপাতালে ও পরে এখানে নিয়ে আসি।
মৌমিতা-আন্টি আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি দেখছি। আপনি শুধু সেই ছেলেটির নাম ও তার মোবাইল নাম্বারটি জয়ার কাছ থেকে এনে দিতে পারেন কিনা চেষ্টা করুন।

সুতপা দেবী-আমি এখনি আনছি।
সুতপা দেবী একটি কাগজে অভিজিতের নাম ও মোবাইল নাম্বার নিয়ে মৌমিতার হাতে দিল। মৌমিতা ফোন করলে-
মৌমিতা-অভিজিত বাবু বলছেন ?
অভিজিত-হ্যাঁ বলছি,
মৌমিতা-আমি ডাঃ মৌমিতা সেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে বলছি। আপনি নিশ্চয় আমায় চিনতে পারছেন ?
অভিজিত-অবশ্যই।
মৌমিতা-আপনি কি আমার এখানে আসতে পারবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কারন দেরী হয়ে গেলে জয়াকে-----
অভিজিত-কি হয়েছে জয়ার?
মৌমিতা-দেরী করবেন না,প্লিজ।

পনের

মৌমিতা-অভিজিত বাবু,কেমন আছেন ?
অভিজিত-ভালো,আমি ব্যবসার কাজে ঢাকায় ছিলাম,আপনার ফোন পেয়ে ছুটে এলাম।
মৌমিতা-আপনি ভাবতেও পারবেন না,জয়া আপনকে কতটা ভালবাসে। এমন ভালবাসা আমি গল্প সিনেমায় দেখেছি, বাস্ত্মবে এই জয়াকে দেখলাম। অতি ভালবাসার কারণে সে আপনার মধ্যে অন্য কোন মেয়ের ছায়া একদম সহ্য করতে পারতো না,আপনার প্রতি তার একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশার কারণে তার কিঞ্চিত মানসিক বিকৃতি ঘটে নি এমনটা আমি বলবো না। আপনার কারনে জয়া আজ মৃত্যু পথযাত্রী,একমাত্র আপনিই পারেন তার সকল অভিমান, কষ্ট ও নিজকে নিঃশেষ করা থেকে রক্ষা করতে।
অভিজিত-আপনি বিশ্বাস করুন,আমি বহুবার তার সাথে দেখা করতে চেয়েছি কিন্তু সে বার বার আমাকে প্রত্যাখান করেছে। তার ফোনে আমি কত হাজার এসএমএস পাঠিয়েছি আমি নিজেও জানি না।
মৌমিতা-আমি জানি না আপনি বিবাহিত কি না ? তবে জয়াকে বাঁচাতে হলে আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন।
অভিজিত-আপনি অবশ্যই আমাকে একজন খারাপ মানুষ ভাবতে পারেন,আমি জানি। তবে আমিতো তখন একজন অনভিজ্ঞ ছেলে মানুষ ছিলাম। আমায় ক্ষমা করবেন।
মৌমিতা-আপনি জয়ার কেবিনে যান,সে আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। আপনার কারনে হয়তো তার পূনঃজন্ম হতেও পারে।
জয়ার কেবিন
অভিজিত-জয়া,আমি এসেছি।
জয়া-এতদিন পরে এলে? আমি তোমার জন্য কতদিন কত রাত শুধু অপেক্ষায়

কাটিয়েছি,শুধু তোমার জন্য। তোমার একটি ফোনের জন্য।
অভিজিত-আমি তোমায় সকাল বিকেল অনেকবার ফোন করেছি, কিন্তু তুমি ফোন রিসিভ করো নি।
জয়া-তুমি আমায় বোঝনি অভিজিত। আমার ভালোবাসা, আমার অভিমান,আমার কষ্টগুলো তুমি বোঝ নি। তুমি কেন বোঝ নি,তুমি না আমায় ভালবাস ? তবে কেন আমার মনের বন্ধ দরজা ভেঙে জোর করে আমায় কেড়ে নাও নি ? আমি সব কথা জমিয়ে রেখেছি,শুধু তোমাকে,শুধু তোমাকে বলবো বলে,তোমার সব এসএমএস আমি যত্নে রেখেছি একটিও ডিলিট হতে দিই নি,-অনেক দেরী করে ফেললে গো। তোমাকে দেয়ার মত আজ আমার কিচ্ছু নেই,আমার প্রাণটা ছাড়া।
অভিজিত-জয়া,তুমি শান্ত্ম হও। আর কোন ভয় নেই। আমি তোমার ছিলাম, তোমারই আছি আর তোমারি থাকবো।
মৌমিতা,সুতপা দেবী, ও ডাঃ অভিজিতের প্রবেশ।
মৌমিতা-জয়া।
জয়া-একি, মৌমিতা তুই এখানে ?
সুতপা-মৌমিতা নয়,বল ডাঃ মৌমিতা, সেই তো তোর অপারেশন করে তোকে সারিয়ে তুলেছে। মৌমিতা না থাকলে যে কি হতো আমি ভাবতেও পারছি না।
জয়া-মৌমিতা,আমায় ক্ষমা করতে পারবি?
মৌমিতা-ও সব কথা রাখ,তোকে একটি সুখবর দিই, অভিজিত কিন্তু আমার বর,জানিস? অবাক হচ্ছিস তো? আমার অভিজিত হচ্ছেন ডাঃ অভিজিত সেন।
ডাঃ অভিজিত- নমস্কার।
জয়া-নমস্কার,আমি কি সত্যি জেগে আছি নাকি স্বপ্ন দেখছি,আমার তো সব বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। সত্যি মৌমিতা আমি আসলেই একটি পাগল।
মৌমিতা-তুই পাগল হতে যাবি কেন ? তুই তো পাগলী ?
অভিজিত-হ্যাঁ সত্যি তাই,তুমি আমার সেই জয়া পাগলী ।
সকলে হেসে ওঠে।

.....

** মনোজ বাহাদুর, বিশিষ্ট সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী।*

কথিকাঃ রম্ভাপতি তপ্তঙ্গ্যা
সংগ্রহে-লগ্ন কুমার তপ্তঙ্গ্যা

বিড়াল কন্যা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। গভীর অরণ্যে ঘেরা এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যে এক রাজা ছিল। রাজার ছিল সাত পুত্র। যৌবন প্রাপ্ত হলে বড় ছয় রাজপুত্রের বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু সর্বকনিষ্ট রাজ কুমার যৌবনপ্রাপ্ত হলেও পাত্রী পছন্দ না হওয়াতে বিবাহে রাজী হয়না। অবশেষে সে মাতাপিতার অনুমতি নিয়ে রাজ্য ভ্রমণে বের হয়। তার উদ্দেশ্য হলো পছন্দ মতো পাত্রী খোঁজা। যেতে যেতে পুরো একদিনের পথ চলে গেল। সন্ধ্যার দিকে একটি পাড়ার পরে কিছুদূর গিয়ে এক বুড়ির বাড়িতে পৌঁছল। সে বুড়ীর বাড়ীতে রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইল। বুড়ীকে সে নানী সম্বোধন করে বলে, নানী, নানী, আমি বহুদূর পথে রওনা দিয়েছে,আজ রাতটা কী তোমার ঘরে থাকতে পারি ? নানী বলল, উহ! একযুগ বার বছর পার হয়ে যায় নানী ডাকার মত হেহ যে, নাই! আস আস ঘরে উঠে বস। থাকিতে তোমার ঘরেতে আমার চাও যতদিন; কোন বাঁধা নাই।
অতঃপর রাজপুত্র বুড়ীর ঘরে উঠল। বুড়ী রাজপুত্র আদর আপ্যায়ন করে রাতের খাবার খাওয়াল। সুন্দর করে বিছানা পেতে দিল' রাজপুত্র ক্লান্ত্মদেহে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পরল' পরদিন সকাল হল। রাজপুত্র ঘুম থেকে জেগে উঠল। সকালে খাবার খেয়ে বুড়ী কোথায় যেন কিসের কাছে যায়। আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসে। রাজপুত্র খেয়াল করল। বুড়ীর ঘরে রয়েছে সাতটি বিড়াল ছানা। সারাদিন সে বিড়াল ছানাগুলো দেখে সন্ধ্যা হবার সাথে সাথে এক একটা রূপসী রাজকন্যার রূপ ধারণ করে। বুড়ী কিন্তু এ ব্যাপারে রাজপুত্রকে কিছুই বলেনা, আর রাজপুত্রও কারোর কাছে জানতে চায়না। এভাবে একদিন দু'দিন করে ছয়দিন কেটে গেল। সপ্তম দিনের সকালে কুমার বুড়ীকে বলল,নানী আর নয়। আমাকে যাত্রাপথে এগোতে হবে। বুড়ী বলল সে তোমারই খুশি। তবে এতদিন আমার এখানে থাকলে। তোমার যাত্রা পথে তো দেবার মতো তেমন কিছু নেই। ওই! এইযে সাতটা বিড়াল বাচ্চা রয়েছে। যদি চাও তো এখান থেকে যেটা খুশি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো।
বুড়ীর কথায় রাজপুত্র একপ্রকার উৎফুল্ল ও আর্শ্চয হলো। মনে মনে ভাবলো। নানী কত দয়ালু। সে এতদিন খেয়াল করে দেখেছে; একদম ছোট যে বিড়াল বাচ্চাটা সেটিই বেশী সুন্দর। আর পোশাক পরিচ্ছেদও অন্য ছয় বোনের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। তাই নানীকে বলল, নানী, আমি একদম ছোট বাচ্চাটা নিতে চাই। তাতে তোমার কিছু বলার আছে ? নানী বলল, সেতো তোমারই খুশি। ঠিক আছে। কিন্তু একটু আদর যত্ন করিও হে। তারপরদিন সকাল হলো সবচেয়ে ছোট বিড়াল বাচ্চাটা নিয়ে রাজকুমার বুড়ীর কাছ থেকে

বিদায় নিল। সে আর অন্য কোথাও না গিয়ে নিজের বাড়ির দিকেই রওনা দিল।
রাজ পরিবারের সকলে জানল যে, রাজপুত্র ছোট্ট একটা বিড়াল বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু রাত্রি হলে কোথেকে এক রাজ কুমারী তার কাছে এসে যায়। আর রাত্রে ঐ বিড়াল বাচ্চাটা দেখা যায় না। এভাবে একদিন যায়, দু'দিন যায় সব বড় বৌদি আর ভাইদের কৌতুহল বেড়ে যায়। ব্যাপারটা কী ? কেন বা কীভাবে এমন হয় ? সবার উৎসুক্য জাগে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি রাজার কানে গেল। রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর সাত পুত্র বধুকে তিনি একসংগে দেখতে চান। সব পুত্রদের তিনি আদেশ দিলেন,আগামী তৃতীয় দিনের বিকেলে যাতে স্ব স্ব বধুসহ দরবারে হাজির হয়। এদিকে বৌদিরা একদম ছোট দেবরের জন্য আপশোষ করতে লাগল। তারা বলাবলি করতে লাগলো,ছিঃ এমনিতে বউ পছন্দ হয়না। ছোট্ট এক বিড়াল বাচ্চাকে বউ করে নিয়ে এসেছে। তা আবার কী? দিনে বিড়াল,রাতে মানবী। এ কী করে সম্ভব ? রাক্ষুসী তাক্কুসীও তো হতে পারে ? তাহলে তো সর্বনাশ আমাদের!
বউ হাজির করার আদেশ পিতার আদেশ পাওয়ার পর ছোট্ট রাজপুত্র খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। রাত্রে ব্যাপারখানা বিড়াল কন্যাকে বুঝিয়ে বলল। বিড়াল কন্যা বলে,দুঃশ্চিন্তা করো? কোন চিন্তা নেই। কেবল একটি কাজ করতে হবে। তাহলে সব সমাধান হয়ে যাবে। কুমার বললো কী-ই-সেই কাজ? কন্যা বলে আমি যখন মানবী রূপ ধারণ করি তখন বিড়ালের চামড়াটা একখানে রাখি। তখন ঐ চামড়াটা পূবন গাছের ডালের লাকড়ী দিয়ে আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে। এতে কিন্তু আমার গায়ের চামড়া খুব নরম তুলতুলে হয়ে যাবে। তখন আমার জন্য মিহি সুতার কাপড়ের সাত ভাজ করে বিছানা করে দিতে হবে। এতে আমি শোয়ার পর ঐ-একই রকম কাপড়ের সাত ভাজ করে আমার গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে। তাতে মাত্র একরাত্র শয়ন করলে আমার গায়ের চামড়া ঠিক হয়ে যাবে। এরপর আমি আর বিড়ালের রূপ নিতে পারবোনা। আজীবন মানবী হয়ে থাকবো।
কন্যার কথামতো রাজপুত্র তা করল। ফলে বিড়াল কন্যা অপূর্ব সুন্দরী কন্যারূপ ধারণ করল। নির্ধারিত দিনে রাজার দরবারে সাত পুত্রবধু দর্শন অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। বড় ভাইয়েরা একে একে স্ব স্ব বধু নিয়ে হাজির। কনিষ্ট পুত্র আসতে বিলম্ব হওয়াতে দরবারে উপস্থিত সকলে উদ্বিগ্ন। সকলে তাচ্ছিল্যভরে নানা মন্তব্য করতে লাগল। অবশেষে ধীর পদক্ষেপ সর্বকনিষ্ট পুত্র তাঁর দেবীসম অপূর্ব সুন্দরী বধু নিয়ে দরবারে হাজির হল। এতক্ষণ ধরে যারা উচ্চরবে বিভিন্ন গালি মন্দ এবং তাচ্ছিল্য বক্তব্য উচ্চারণ করছিল সকলেই নিশ্চুপ হয়ে গেল। রাজা দেখলেন তাঁর সাত পুত্রবধু। তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধু রূপসী বিড়াল কন্যার দিকে দীর্ঘক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে পরে মাথা নাড়লেন।

.....

** লগ্ন কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক।*

জড়িতা চাকমা

মর স্ববনর জুরোছরি

গেল্যে কিল্যে লুঙিলুঙ্গি রাঙামাট্যাত্তুন,
এযেত্তে কেল্যা ফিরি যেম জুরোছরিত্তুন।
চিগোন-দাঙর ছরাছরি, কাপ্তেই গধা ধেবা পানি,
ধেবা পারত জুম্মউনর চিগোন চিগোন ঘরানি।
অজল নিজো মুরো-মুরি, ধেবাত ভাঝে তার ছবি,
কি এক্কান দোল জাগা, নাঙান তার জুরোছরি।
দোল দোল মানয্যর, দোল দোল মনানি,
যিন্দি চায় দেঘা যায়, কাপ্তেই ধেবার এ্যাইল পানি।

যক্ষা বাজার, বনযোগীছরা দ্বি-সেরে আঘে ধেবাগান,
কদ্দাকদ্দা ওই যিয়ে এই দোল জাগাগান।
সক্কে দিনত এ জাগানত কধক এল' সুখ,
ভাদে-কাবরে, টেঙা-পয়সায় নদ] এল' কন' দুখ।
জিংকানিত কন' দিন পুরিদ' ফেলেই ন'পারি,
ঘনাঘনি, ধেবাপাড়, এই জাগানি থেই জুরি।
জুরোছরি কেজান এল', এক্কেনা গোরি ভাবিচ',
সুগে-শান্দিয়ে কাদেবং দিন, কধক স্ববন দেখ্যেইদ'।

ধরাধয্যা এগত্তর গোরি, সংগরি চলিবঙ,
এক সমারে লারেই গোরি, জিংকানিয়ান কাদেবং ।
কাপ্তেই গধা অভার আগে, কধক দেখ্যেই দোল স্ববন,
ধেবা এল' ডুবি গেল', জুরোছরির মানেক ধন।

গধা পানি ধেবা তলে, বেক দুঃখানি ডুবি যোক,
জুরোছরি পুগ' মোনদ রাঙা বেলান উদয় ওক।
জুরোছরি কূল্যাউনে, নুও গোরি স্ববন দেগোদোগ,
অন্যায় অবিচার এমুরত্তুন, জনমদ্যায় উধি যোক।
কাপ্তেই গধা পানি এল', বেক্কান সর্বসান্দ গোরিল',
বর পরঙ পাদেল', জুম্ম ধেবা জাল্যা বানেল'।
জুম্ম জাদত কন' কালে, জাল্যা ন'এলাক,

মরন' গধা বানিন্যেই, জুম্ম জাল্যা ওই পেলাক।

এজ্যা কিজু কিল্যে কিজু, এত্তে এত্তে ভালুক্কুন এলাগ,
এনে এনে এচ্যা তারা অলাক পাঁচ লাখ।
কি দোল এল' সেক্কেনে, জুম্মগুনর্ জিংকানি,
আর' ফিরি পেদঙ চেই, আগ' সুঘর জিংকানি।
থেবং আমি জধা ওই, গমেদালে কাম গরি।
ন'যেবঙ আর বর পরঙ, থেবঙ ইধু সংগরি।
ফিরি এব' আওঝর সেই, আহ্ঝি যিয়া সুখকানি,
শান্দি পেব' মনানে, দেগিলে এ্যাইল ঝারানি।

পরান'র জুরোছরি কী-নাঙে তরে ডাগিলে,
ম' মনান হুঝি অভ' তর আহ্ঝি মুওন দেগিলে।
পূগো মোন এহ্লান দিন্যেই, বিন্যে বেলান উধেধে,
বেল্যে অলে ত' ছাবাবো, ধেবা পানিত নাজেদে।
জুরোছরি ধেবাপারত, অজল নিজো ঝারানি,
কি দোল জুরোছরি কূল্যার, চিৎদিগোল মনানি।
রাঙা কাদি বুগত বানি, কালা পিনোন পিনিন্যায়,
মোনো ঘরত, ছরা পারত যেন আঘছ থিয়েইন্যায়।

জুরোছরিত পথম এলুঙ রাজনীতির পয়দানে,
ত' আহ্ঝানায়, ত' মাদানায়, হুজি মর মনানে।
আগে এল' ত' বুগত, নন্যাসিল' কুও পানি,
সেদ্যায় ভিলি গম আঘেদে, ইধু মানষ্যর মনানি।
ত' লবিয়ত ত' কোচপানা, পুরি ন'-ফেলেম জিংকানিত,
পথম দেখ্যা জুরোছরিত, কাম গোরিলুং দিন্যান দিগ।
আগ' ভালেদি ফিরি এযোগ ইয়ান বর মাগিন্যায়,
কুজি-রাজিয়ে ফিরি এলুং রাঙামাট্যা লঞ্চত উধিন্যায়।

.....

.....

** জড়িতা চাকমা, কবি, রাঙামাটি।*

প্রশস্তি চাকমা

কোচপাং তরে

তুই নেই আমা কায়, আগে তর কোচপানা
সে কথা ইধোত গরি এ জিংকানি কাদানা
দুগ গরি জনম দিনেই পিথিমি দেগেয়োচ
কধক দুগ গরিনেই আমারে পালেয়োচ
নিজো খেয়াল ন' রাঘেনেই আমা খেয়াল রাগেয়াচ
যেদক দুগ ওগ সিয়ান আহ্ঝা পুরেই দিয়োচ
ন' যাজিনেই ন' বুঝিনেই কধক দুগ দিয়োং
ম' জিংকানিয়ান পোতপোত্যা ওইয়ে ত' সান্যেন মা পেয়োং
কধক দুগ গরি পেয়োচ এ জিংকানিত
কার' মুজুঙে ন' দেঘাচ সে দুককানি
নিজো কধা ন' ভাবিনেই মানজোর দুগ চেদে
আহ্ঝা গরঙ একদিন সে পুন্যর ফল পেবে
এধক ঝাদি আহ্রেম তরে ন'ভাবং
কনদিন সুজিবার সুযোগ ন' পেম তর এ কোচপানার ঋণ
কন' কিচ্ছু আহ্ঝি গেলে পরে ফিরি পায়
এমন দুগর জিংকানি মা আহ্রেলে মা ন' পায় সুগ
পেবার অক্ত ওইনেই তুই গেলেগোই
মাধাত্তুন গাঝ' ছায়া সরি যিয়েগোই
তরে লোইনেই কধক নিজেনি জমা আঘে মনত
ত' সান্যেন মা মাঘং জনম জনমত
ত' নীতি ধরিনেই মুজুঙে যেবার চাং
মনত্তুন কঙর মুই মা তরে কোচপাং।

.....

** প্রশস্তি চাকমা, ছাত্রী, বিবিএ, শেষ বর্ষ।*

তরুন কুমার চাকমা

মুই এক জীবন আহ্‌রা

মুই এগ জীবন হারা পেগোধক্যা
ম' ঘর কুধু ঠিগ্‌ নেই
ম' গীদ ভাঙা ভাঙা
ম' গীদর সুর নেই ॥
এই দুনিয়েত্‌ জাগায় জাগায়
বেরেই বেরেই থাঙ
এই দুনিয়া দুগো ভরা
দুগর গীদ লেগি যাঙ
কি দিম কারে দুগর গাঙত ডুবি থেই ॥
তমা মুজুঙে কি গীদ গেইম
সুর নেই মর গীদ ন' জানং
চোগ' পানি মর আঘে
তুমি নেয' দি যাঙর
ঝু জানাঙর বেগরে কোচপেই ॥
তমা কোচপানাত লগে থেদুং চাঙ
তমা আহ্‌ঝিবোত গলে ম' মনান
কোচপাঙ তমারে মন-দি বেগরে
ঝরাপাদা কোর উধিব' বেগে মিলি সঙ অহ্‌লে
সু-পদথ চলিফিরি এয' আহ্‌ধি চেই ॥

.....

** কবি তরুন কুমার চাকমা, রাঙামাটি।*

জুনপহ্‌ত জুম্মবী

প্রগতি খীসা

নিমন ভাদ'-আসিন মাঝর জুন' পহ্‌রর রেদোর
লালজে চিদমন ভিজেয়্যা বয়ারত
আগাজর ধুব মেঘখানি
চাকবানি ভাজি যায়,ভাজি এযে
মনচিদ্‌ত তম্বায় তম্বায়
বযত্তিগরে একবুগ আরাচাগ জাগুলুক স্ববন
জীংকানির গঙে যেয়্যা দিনুন
মুজুঙদ্বি ফিরি ফিরি পেবার চাই মনানে
জাগুলক মনত নানা কিজিমর
কধা গুঙুদো কারে বার বার
ফিরি যেদুঙ আরাঙ জীংকানিত।
আগাজর চানানর সমারে
জুম্মবী গাভুরী আয়পায় গরে
জুনপহ্‌র ছদগে ছদগে
জুম্মবীর দন্ধুগর বুগ
দবাসিলে জীংকানি কদগদিন
গোঙে যেব তরমর জীংকানিত?
আগাজর মেঘকানি চাগবানি ভাজি যায়
তে,সালেন আমা দুক্কানি
জাঙার বানি থায় কিত্তেই ?
জুম্মবী কেচকুমরী রুবধরি
উরিউরি তা' কেয়্যা ছদগ্‌ত
তরমর মন দুক্কানি ধোইপুজি
ন্যুহ দিন মাধান ফিরনি দিবার পইদ্যানে
আমা'দেনে বাঙে উরিউরি থেইনে
বযত্তি গত্তো চাই জনম জনমভূরি ।

জ্যোৎস্না রাতে জুম্মবী (বাংলা অনুবাদ)

ভাদ্র-আশ্বিনের ধবধবে জ্যোৎস্না রাতে
মৃদু মন্দ হিমেল বাতাসে
নীলিমার সাদা মেঘগুলো
ভেসে আসে,ভেসে যায়
মনের আকাশে কি যেন
অসংখ্য ঢেউ উঠে জুম্মবীর
যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখের
ভাবনাগুলো উদাস করে তোলে বার বার
হৃদয়ে সাধ জাগে
আদিমতার জীবন সন্ধানে
জ্যোছনা রাতে জুম্মবী একাকার হয়ে
শরতের মেঘমালার উতাল তরঙ্গে
চাঁদনী আলোর প্লাবনে
বিমূর্ত জুম্মবী
শরতের আকাশের
মেঘের ভেলায়
হঠাৎ উধাও হতে চাই
কেশকুমারী কন্যার রূপ ধরে
চাঁদের আলোয় আলোয়
লুকোচুরি খেলা করে
মাতিয়ে রাখতে
জুম্মবীর কাঁদে প্রাণ
ফিরিয়ে দিতে চাই-
সেদিনের সুখের দিনগুলো
প্রহর গুনেও স্বপ্ন দেখে
চিরদিন বেঁচে থাকবে বলে
তোমার আমার অমলিন
ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে।

.....

** প্রগতি খীসা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।*

জগৎ জ্যোতি চাঙমা

সময়ান আহ্ধি যায় মুজুঙে

কাদি মাঝর রেত–এজ' জারানে লঙ্গুর বুজ্যের বর্গিত কামর ন' বজায়,–
শিরপানির এজ' ন' বারে আওচ্চান ঝরিব্যের কলাগাজর পাদায় পাদায়;
তারাগুনে জাগি জাগি বাচ্ছেই আঘন শলগর আঘাজত দাংগু জুনানরে;
কদক্কনে উধিবো জুনানে–ধল পহরর বিচ্ছোন বিজেব' কলগর আগারে।

ইক্কুনু ইধু দুরর মোনঘরথুন ধুধুগর র' আর শুনো ন' যায়;
চিত্ররেগা বারমাস মাদেবার পুরনি আমলর অক্তআনে ইরুক লাজ পায়;
রেত দিবোর সং ধাবা দে কাঙেল বেঙা গরি টেক্সিগানি আবাজ তুলি তুলি –
পরা ডিজেলর বাচ ছিদেই ছিদেই–যক্কাবাজারথুন রাস্ত্মামাধা বরইতলি।
কজমা গাভুরির মুওন কদবলা জলি উধে স্টার জলসার সিরিয়েলর –
অম'কদ' তামালাক-নুদি কিরিমিরি দেই–চোঘত ভাজি উধে কার মু গাভুরর।

তুও দ' লুলংছড়ির তরুনো কলগত রেত্তানে চুবেচাবে লামি এযে;
ফরাসবিন গাচ্ছুনর লুলং আগাগুনোত ধল আন্ধারানে কেয়েগান ঘযে;
লক্ষনদাগির আলুর খেদত অহ্মা ঘুঙুরোয় কিযেক সারে খেনে খেনে –
কবাঘুম ভাঙিবের অক্ত অয় চিজিবোর;–কার পৈদেনে –
কাদি মাঝর এই রেত লামে খাগড়াছড়ির পারত কিজেনি কিত্যেই?
চিগোন নলখাগড়া দুবোত দিবে-ইক্কো দোক-বগা আবাদা ঝকপেই –
দগরি উধোন,–দুও ঝাগারেই লরিসরি এগেমে থিধে অন;
পজিমর বৈয়েরান এ্যয় খঝত্তিবনরে লালজে আল্যেং গরে কানক্কন।

গোদা রেত্তো জাগি থায় তারাজাঙাল–উত্তরথুন দঘিনর অভলা –
গাং পারত তিন্নো থিদিপেখ–চোঘত ঘুম নেই–গর্তন কি সল্লা?
এগ সময় রুবরং রদত চরি চানানে এযে,–সমার অয় তারাজাঙালর;
সময়ান আহ্দি যায় মুজুঙে-কক্কনে তে লাঘত পেব সনারং দিন্নর।

.....

** জগৎ জ্যোতি চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।*

কে ভি দেবাশীষ চাকমা

দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহ্‌ল'

অহ্‌গুর গাঝ-বাশ তারুম
সয় সাগচ্ছে লধি-লম্ব
পেঝা-কজা, অহ্‌গুর এ্যাল ঝার।
গাঝ' ধেলায় ধেলায় পেঘো ঝাক
উরি উরি ফুলত পত্তন পত্তাপত্তি
নাঙ শুন্যং রাঙি ক', তগাঙর নিমোন গোরি।
গাঝে গাঝে, বাঝে বাঝে আ মাদিত পরি
সাগর দগত্তন পেঘ, কবু ধোরিম রাঙি ক'!
চিগোন-দাঙর দোল দোল পেঘ দেঘি উলো মস্ত্ম অং।
রাঙি ক' তগাঙর মুই, গাঝ ধেলাত চাং,
বাঝ' আগাত চাং, লধিত চাং,
কায় চাং, দুরোত চাং,
রাঙি ক' ন' দেঘং।
রাঙি ক' তগাঙর চে তগাঙ
এন অক্তত কদ' পেঘে কল কলাদন।
দুরোত আবাদা গোরি চোঘ যেই দেঘিলুং উক্কু সোস ক'
সিভে দেঘি মনে গল্যুং, ইভে অভ' রাঙি ক'।
আঝলে সিভে রাঙি ক' নয়, এ্যাল ক'
উজু গোরি কধ' চেলে, তারে মুই ন' চিনং
নাঙ শুন্যং বানা রাঙি ক'।
বেন্যা পুত্যেক্তুন ধোরি তারে তগাদে তগাদে
বেল উধি দিবোর ওই বেল গেল'
তুও তারে দেঘিবের আঝা ন' ফুরেল'।
এক ঝাক পেঘো লগে তেয়ু এল'
রাঙি ক' ন' চিনং মুই
দেঘা ওইনেও দেঘা ন' অহ্‌ল'।

.....

** কে ভি দেবাশীষ চাকমা, বিশিষ্ট কবি, দিঘীনালা।*

বীর কুমার চাকমা

জিংকানীর থুম ধুঝিত

আহ্‌ধি আর ন' পারঙর মুজুঙেদি !
বল পোজ্জ্যে কিয়্যে চেরোকেইত ঘুপঘুপ্যা আন্ধার।
মুজুঙে উযেবার কন' পদ নেই !
পিঝেদি অঘুর দমদমার দেলদেলি,
পিচ্ছে লামিবেরও কন' ভ' নেই।
লারে লারে বোই যার পিয়োগ্‌ পিয়োগ জুরোভাব,
গদা কিয়্যে ছন্‌ মরি এযের,
পহর ফুদেবার নেই কিয়্যজন !
বেগ পদ নাদা যিয়্যে, দলামহ্‌ঝা জিংকানী।

ঘিনে ধোজ্জ্যে এ সমাজ, এ পলিটিক্স,
জাতপাত্‌, ভেইয়্যে ভেইয়্যে মারামারি,
শেজমেজ নিজ'রে, নিজর জন্মগান'রেয়্য।
ভেইবোন ইত্তোকুদুম বেগ'রে।
বেগ চোকহাদা পিত্তীমি, পিত্তমীর মানেয়।
আহ্‌ওজর মা'র বুগ, আহ্‌ওজর হিল চাদিগাং !
এজান ধ' অহ্‌ভার কধা ন' এল',
বেসুনজুক পরাকবাল্যে অহ্‌লে এজানই অহ্‌য়।

ইয়েনিলোই লারেই গত্তেগত্তে অহ্‌রান
আর কন' বল নেই, বেগ থুম।
জিংকানীর থুম ধুঝিত জিরেবার আহ্‌ওজে
লাগিবো এগলেজা সুগোর ঘুম,
জোলনেই অলর, লরচর নেই.....

জীবন সায়াহ্নে (বাংলা অনুবাদ)

আর পারি না এগোতে !
ক্লান্ত্ম অবসন্ন চারিদিকে নিকশ কালো অন্ধকার।
সামনে এগোবার কোন পথ নেই,
পেছনে অসংখ্য চোরাবালির স্ত্মর,
পিছু হটবার ও কোন জো নেই।
ধীরে ধীরে গ্রাস করছে হীম শীতল পরশ,
সমস্ত্ম ইন্দ্রিয় অবশ হতে চলেছে,
এক টুকরো আলো জ্বালাবার কেউ নেই,
সকল পথ রুদ্ধ! বন্ধ্যাত্ব জীবন।

ঘেন্না ধরেছে এই সমাজ, রাজনীতি,
ভেদাভেদ, হানাহানি, দলাদলি,
সবশেষে নিজেকে, নিজের জন্মটাকে।
আত্মীয় পরিজন সবকিছুতেই বিদঘুটে ঘুন ?
বড়ই স্বার্থপর এই সমাজ, বসতিজনেরা।
প্রিয় জন্মভূমি প্রিয় স্বদেশ !
এমন তো হবার কথা ছিল না।
বোধ হয় আজন্ম পাপী হলে এমনই হয় ?

এ সবের সাথে নিরন্ত্মর লড়াইয়ে
কোন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই।
অবশেষে জীবন সায়াহ্নে
একটু বিশ্রামের প্রয়োজন,
চির প্রশান্ত্মির একটু ঘুম।
নিশ্চুপ ! নিস্ত্মব্দ ! নিথর.....

.....

** বীর কুমার চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।*

বারেন্দ্র লাল চাকমা

আত্যা নাদিনর দ্বিয়েন কধা

নাদা অহ্রক আগে মাদেয়্যে নেই
লেঘা আঘে লাচ্চার নেই
জাদ' ভাচ উধি যার
কধাবাত্তা বদলী যার।
এ্যাহ্ল এ্যাহ্ল তরুমঝার
নেই আর নেই আর,
ভূইমাধি ডুবি গেল
নিজর দেঝত পরবাস
এঙেরি জীংকানি কেঙেরি গঙেবং?

ও আজু তুই কদেয় চাং!
নাদিনর কধাগুনি মাধাত আহ্দ দি
আমক চোগে রেনি চেই তে আঘে!
ও আজু তুই ভাবি চাহ্
এগ'জনে এগামনে
জুরগরি বঝিথেবার নয়
জদা বলে সং সমারে
সজেই উধি উযেবং
বুগত বানি মন বল।
ও আজু তুই বর দে আমারে
মা বোন বাপভেই বাজেবার
বংশবাত্তি জ্বালেবার
দেঝ জাত গমেদালে
সাজেই গুজেই তুলিবার
ঘরতবোই থেবার নয়
যেবার দে সময় ওইয়ে
কামগরি সমারে আহ্দেপাদালে।
নাদিনর কধা শুনি
আ কবালত আহ্ধদি

কয় কোজলী গরি
ও নাদিন লগ শুন শুন ম' কধা
যুনিও ওই বুরোর কধা
কুরোর ঘু-দলা
দেগনি গদাদেঝ সংসার
কী অহদে ঘদের
দল বলত লরা লরি
মারা মারির থুম নেই
রেত্তো এলে ঘুম নেই
যেই পাদন ধেই পলেই।

ও নাদিন লগ
আর' চহ্ কী ঘত্তে কী ঘদের
আহ্দ কাবা থেংকাবা
আদামরা পরান ঘর দুমদুমম্যে
পরান ওইয়ে ডুগুত ডুগুত
দারু ওইয়ে স' মাঝর পদ
কা'রর তালাচ কা'রর নেই
নিজের মেইদ নেই।
মা বোন বাবত্তেই
জাদ কুল দেঝকুল
নেই কা'রর তত্তি তালাচ
নেই নেই ডাক্তর বৈদ্য কবি রাজ
ও আজু দেঘর নি কী ঘত্তে কী ঘদের
রাজা আঘে দেঝ নেই।

ও নাদিন লগ দেঘরনি
জুম' ধান পাগানাদ
বয়ঃ কন্যার জ্বালাতচ্চে
ইন্দি ধাবেলে উন্দি খাদন
উন্দি ধাবেলে ইন্দি খাদন
যোগার পারি র' বেরা
বাদোল তম্বক কেরাপ কাবুক

লক' ন' ধরের
কাপ্পে ধান ভুরি নেদন
বান্যে চোললেই কারি নেদন
মানা গল্ল্যে গরন তারা
আরবেচ ভেঝেইদে পারা।
এ অবত্যেই, ও নাদিন লগ
কী গরিবা মান ইজ্জোত স'সম্পুত্তি
কেনে বাজেবা ক'না।

ও আজু ভাবি চাহ্
আমা কধানি আমল দি শুনি চাহ্
লো এরাথেই নিবিব্যে থেবং কেনে চেই
মরাশুগুনি আগুনত দিল্যে তিন পাক খাই!
চিল' দরে কী কুর' ছহ্ ন'পুচ্চং?
এ বার সালে ভাবি চাহ্
জাদ থেলে দল থেব'
দল থেলে বল থেব'
জদাই বল জুওত
বেক শক্তি যুক্তি ভুক্তি মুক্তি
সম্পুত্তি সুওত।

মানেই পিথিমিত মানেই থেলে
কধা বাত্তায় সং ন'অহ্লে
মরা মরি লরা লরির থুম নেই
নানা পির্যেই ধরিবো
ঘর' কনাত থেলে কী তে বাজিবো?
এগ কধায় কধা নয়
দঝে বঝি যিয়ান কয়
সিয়ান এগ দিন নয় এগ দিন
ফল দিদো কয়।

ও আজু সেত্তেই
থেং ভাঙোগ বা আহ্দ ভাঙোগ
থেদং সেই বুগত বানি বল
বন কিত্ত্যেত ন' থামেই
যেবং জদাই উযেই উযেই
আঝা বারে আয়ু কমে
ইষ্যেত থেলে দেবং
কবালত থেলে পেবং
সুগোর স্ববনর আঝা পুরেবং।

.....

** বারেন্দ্র লাল চাকমা, বিশিষ্ট কবি, শলকদোর,বরকল।*

স্মৃতি জীবন তালুকদার

নোনেয় গালনি

আওজ গোরি রাগেওন
পুওবো নাঙান মরত
নোনেয় গালে বানা বানা
বোজি থায় করত
মানা গোল্যে ন', শুনে
ভিঝে বানা ঝরত।

ভাত খেবার আলজি গরে
মা-বাবে দোন খাবেই
এক গরাচ্চোই ভালক্কন
থায় চাবে চাবে
উন বার মাস ভূগে
বানা বানা জ্বরত।

কধা কলে ন' শুনে দিন্নো ভঙে বানা
কার' কধা ন' ইহ্লেয় ন' মানে মানা
হাক্কন ন' থায় ঘরত।

লেঘাপরা আলজি গরে
ঝুরে পরাত বলে
দোল গরে কামানি
তার মনে অহ্লে
আন্দারত ঘুম ন' যায়,
ঘুম যায় পহ্রত।

বরদেন্দু চাকমা

রাঙা অল' ছরাগাং

চেঙেই লোগাং
রাঙা অল' ছরাগাং,
নেই কন' কাবিদাং
আরেলাক জাগান।
নান্যচর কাউখালী লংগদু
বাঘাইছরি মিঙিনী বাম
মাহ্লছরি দুগোর নিজেনি
অহ্রিণা জুরছরি নন্দরাম।
এধক অন্যায় কমলে অভ থুম
ভাঙোক জুম্ম জাদর ঘুমান,
উজে যেই ন'দরেই
উধিব আমা সুগো বেলান।

.....

** বরদেন্দু চাকমা, বিশিষ্ট কবি।*

.....

** স্মৃতি জীবন তালুকদার, শিক্ষক, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী, বনযোগীছড়া।*

পাট্ টুরু টুরু চাঙমা

সিঝি ফুল বিঝু মূল বিঝু গোজ্যাপোজ্যা বিঝু

বঝর ফিরি এল' আমা সিদু
সিঝি ফুলবিঝু-মূলবিঝু গোজ্যাপোজ্যা বিঝু
মনত উধে চিগোন কালর কধা
সিঝি বিঝু বিঝুগুলোর ভুলগালানা
বুড়ো-বুড়িরে দধক গাধেই দিদঙ
আমা আহ্মানি দোলে দালে সাজে সোজাই বরমাগিদং
বিঝু এবার অক্তআনত
বিঝু পেক্কো দাগিদ বেগ আদামত
বিঝু পেক্কো র'বোলোই
বুজিদঙ সিঝি বিঝু কায় এচ্ছেগোই
জুগুলেদং সেক্কেত্তুন ধোরি পাজন তোনর জিনিসসানি
কনে কধক, কয় বাবদর জুগুলেই পারে
লারেই গত্তং সেনিলোই
থুবেদঙ বেজ বাবদর তোনপাত
আদামে আদামে কধক খেইয়েই পাজনতোন
ঘরে ঘরে গোলাক ফুদেই
চিগোন কালে কধার পইদ্যানে
বজমান গম লাগিধ' সেক্কেনে
কধক ফুদেদঙ গোলাক বাজি
দরেই দরেই বাজি ফুধেদঙ ভুঙভাঙ গোরি
ইহ্ধত আঘে চিগোন কালর সং সমাজ্জেলোই
এ-মুরোত্তুন ও মুরাত বিঝু খেধঙগোই
দিন্নো খেধঙ বিঝু
গম লাগিদ' চিগোন কালত ইজু
বেল্যে ফিরিধঙ পেত টিঙটিঙে গোরিনেই
সুগে দিন কাধেদঙ আমা মুরল্যা চাদিগাঙত
ন' এল' আমা সিদু হিংসে হিংসি
সেক্কে দিনত সুগ গোরিদঙ আমা হিল
চাদিগাঙত
ফুল বিঝু পরেন্দি এদ' নুও বঝর
নুও বঝরর কোজোলি দিনত গোরিদঙ
পূণ্যকাম
গম লাগিদ' আমা জুম্ম জাদর চিন্নয়ান

.....

** পাট্ টুরু টুরু চাঙমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।*

উদয় শংকর চাকমা

আধঙ

বেন্যে অহ্লে ঘুমত্তুন জাগি
আধং আঘে উধোন ধাগি
মরা গাজ কত্তা কেম কুদো
মরাপাদা পুজ' পুজ'
ছিত্তিরিং পাত্তারাং ছিদি আঘে,
একদিন নয়, দ্বি দিন নয়
অনজুর দিম্মানে কজরা অহ্য়
কুত্তুন এযে এ কজরা ?
তোগেলে ন' পায় মাজারা
অতালিয়্যে কজরায় উধোন ধাগে।
দোল ন' লাগে কজরা উধোন
গ্যেনীয়্যে পিচ্ছোল গোরি চুরোন
অমানুজে আধং গরন
নিজরে নিজে বজং গরন
কজরা উধোনত গম মন ন' পায়,
বানা ঘর' উধোন নয় আধং
কিয়্যে গরন ঘর আধং
সমাজ কজরা এক দাগি
দেজ কজরায় আঘে জাত ধাগি
কজরা জাগাত বজং নিত্য লাঘত পায়।
দেকখ্য শুন্য জ্ঞানীউনে আধং ন' গরন
নিজে যেমেন ন' গরে মানজোরে দিনেও ন' গরন
দরমর গোরি থান তারা
যেনে আধং সুমি ন' পারে পারা
আধং পোইদ্যানে উঝে থানা জ্ঞানীর ধারাজ,
সমাজ কজরা দেজ কজরা
অসভ্য জাদর মাজারা
ঘর'র চেরোপালা দেলে বুঝি পারে
গিরোজর মন কত্তামান দোল ওই পারে

.....

** উদয় শংকর চাকমা, বিশিষ্ট কবি, রাঙামাটি।*

পহ্র চাঙমা

কুধু লরবো জুম্মল্যান্ডান ?

কুধু লুগি গেল
"এম এন লারমার" ফেলাঙ ফেলাঙর স্ববনানি ?
ইচ্যে দিন দিবেচ্যেমাই সন্ধভাঝ মাদদন্নে
অক্করে কাচ-কাবাচ্যে ভদাঙ ভদাঙ র'-য়ে ?

কুধু আঝেলাক
মার্ক-মাও-লেনিন-চে-চেলা দাগির তেচ্চানি ?
চোগ' পানি ঝরিয়ে রণ' ক্ষেত্রর পচ্চনে
ধারায় ধারায় জুম্মোগুনর গণ লাইনর বরর্ব ?

কুধু সুম্মুরি-লাক
বাগ থুম ন' অহ্দে বেঙা-হঙা গাঝ কত্তানি ?
কিজেনি ! নাকি ডুবেই দিলাক

৪৫,০০০ হেক্টর হাপ্তেই বর গাঙর তলাদ ?

কুধু ধেই গেলাক
আমা বাঘা বাঘা লরবো আগুন লুরুগুন ?
যে আগুনত পুরি দিদঙ কজরা ঘেরেঙর
বরকল-বিলাই-লংগদু করল্যাছরির ওমা ব্যারাক্কানি ?

কুধু চোব মারি আগ
মিল্যে কান' ধক জুম্মল্যান্ডর পদে ঘাদে ?
কিইয়ে ন' ফুরায়নে এক্কাও, হে ত'মার!
নেদে নেদে দ' বেগ নি ফুরেলাগ !

কুধু কন ফ্রিজদ থলা
রিবেঙ গিরগিরিয়ে জুম্মর গঙর রমঙানি ?
ওহ, চাগিচেদাও জুম্মলক ঝাদিমাদি
ঝুলদে চুগেই যেই ফুরে যাত্তে জুম্মল্যান্ডদ !
কুধু, ক-হ-য় ন'দেগঙর দ
আদিবাসী জুম্ম চেলা "এম এন লারমার" য়েমানি !
শিগে-দিগে যিয়ে লরবো জুম্মল্যান্ডত্তে
ঠিগেইদ পিত্তি পেবাত্তে কোচপানার জুম্মল্যান্ডার গঙ !!

** পহ্র চাঙমা, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী, রাঙামাটি।*

সঞ্চয় চাকমা

চিধে বুগ'র চিধে চিধে কধা

ভাঝি আঘে এককত্তা নারেকুল।
কায় কায় আজাআজ্যা ইক্কো গোরি তারা
তা সমারে তে কধা কয় পত্তাপত্তি চোকমারা
মুই আঘং মর সাঝন্যা তারাবো ধগ বানাবান্যা।

রেংখ্যং মহ্ অয়
বোয়্যারান থ' অয়

দাবাবোর ধুমোয়ান গুথ্যার গাভুরান
দাগি আনে ভাঙে আনে খচ্ছেই খচ্ছেই
চিধে বুগর চিধে চিধে ক'ধানি
আঙারায় আঙি যেইয়্যা ছলগর র'আনি।

আহ্ঝ' পাল পাক মেলি দুগে দুগে দুক ভিলি
উরি যাদে যাদে তারাবোর কায়কুরে
ম' সান্যা তারাবর কাত্তেই চিত্পুরে।

** সঞ্চয় চাকমা, বিশিষ্ট কবি, নান্যাচর।*

পঠন চাকমা

আমি কাম্মো

আমি অলং জুম্মো
দিনরেত আমি কাম্মো
মুরোত্তুন লামি টাউনত এত্তন
দেঝ বিদেঝ ঘুত্তন
রাঙ্গাকালা স্ববন দেক্কন।
হিলচাদিগাং গন্ধা ধর্য্য
মানুষুন বেক্কুন অলর
চুদোমু গুরি ধুনধুক খেই
গালত আহ্দদি আমোগ ওই আগন।
এ্যাইল বন কাদাক কাদিক অইয়ে
কই ন'পারে সই ন'পারে
বুক দিবা দিব্য পদ চিবা চিপ্যা
বুগত ন'আদে খুলি কোই ন'পাচ্চ্য।
যিয়ান শুনি ন'পারে সিয়ান শুন না
যিয়ানি চেবার ন'চেই সিয়ানী সানা
কি অল' এই জাগা কি অলাক এই মানেই
কি অই গেল এই দোল তারুম ঝার।
হিল চাদিগাং এ্যাইল গাঝ বন লাংদা
বার'জার ধুমোয় বেগ সারানাদা
কমলে মোন মুরোউন কোচপাপি অবাক
কমলে আহ্দে আহ্দ চুমাচুমি গুরিবাক
এ্যাইল মুরোত গাঝ বাঝত নৃও রঙে কোর উদোক
আগাঝর কালা মেঘ কাধি যোক
পেক্কুন কমলে দুও মেলি উরিবাক
পরান বলা কমলে এগ ওই উভগীত শুনিবাক।

.....

** পঠন চাকমা, বিশিষ্ট আদিবাসী সুরকার, গীতিকার ও শিল্পী।*

কাজল রেখা চাকমা

পুঝে মাঘে বাঘ গুজুরে

জার কাল এলে আগ' দিনত জারত্যেই ন'পারে,
বেন্যা বেল্যা বারে থেলে খানক্কণ আহ্ত ঠেং ছনমরে,
বেল্যা মাদান ঝাদি গোরি পহ্রে পহ্রে ভাত পানি খেই,
বেজ বাগে ঘুমত পরন্দই রোজেই কাবর উরিনেই।
টাপসালত আগুন জ্বলি কিয়ই থান দাবা খেই খেই বৈ,
আগুন কুয়াবাক কদক্কণ ঘুম এলে-তে পরন্দুই।
মুই চিগন থাক্কে একবার আমি ঝাদি গোরি ভাত খেই,
ঘুমত পোছ্যেয়্যই বেক্ষুনে যার জাগাত তে যেই।
ঘুম যেই ন'পারং সেক্কে মুই, রেত কন্দুর অইয়্যে কিজেনি
ঘুম যেইয়্যন বেক্ষুনে কান পাদি রইয়্যং শুনি।
ঘুর কার্ত্তন কয়জনে কিয়ই মাত্তন ছন্দ বাজ।
খুওয় চেরকিত্যা দেঘা ন' যায় গাছ বাজ।
আদেখ্যা গোরি কি শুনিলং সিভে কি দগরের?
দোলেই গোরি শুনি রইয়্যংগে হাউম হাউম গরের।
ভাবি চাংগে নাকি বাঘ অহ্ব, আর' শুনং কান পাদি
কনদিন ন শুনং মুই বাঘ গুজুত্তে আগেদি।
পুজে মাঘে বাঘ গুজুরে সেক্কে শুন্নংগে নানুত্তুন
ভাবি ভাবি ঘুম যেইয়্যং পত্যা উধি ঘুমত্তুন
মামু দাগিত যেই নেই পুঝর গছ্যংগোই নানুত্তন।
এচ্যো রেদত কি দগোছ্যে শুন্যছনি নানু তুই?
দরেইয়্যংগে এক্কানয় জাগন এলুং গায় গায় মুই
নানু কয়দ্যে বাঘ আয়, তেয়্য ভিলে দগত্তে শুন্যে
সেত্তুন ধরি কই পারংগে বাঘ র' কেযান্যা।

.....

** কাজল রেখা চাকমা, বনযোগীছড়া।*

মনে কয়
বিকেন চেগে

মনে কয় মর-
পিথিমির নেইয়ে মানজ্যেরে এ্যাহ্ঝাল দিবের
কানিয়ে মানজ্যের চোঘ' পানি পুজি দিবের
লেঙ-আদুর আ বুড়ো-বুড়িত্ম গমে সেবিবের
রাঙা বেল ওই পিথিমিয়ান পোতপোত্যা গোরিবের।
মনে কয় মর-
রেদো জুনান ওই বেঘর মন জুরে দিবের
পিবির পিবির আহ্ভা ওই কাম্যের ঘাম সুঘেই দিবের
দাঙর বট গাঝ ওই আহ্ধিয়ে উনোরে ছাবা দিবের
পধ আহ্রেইয়ে মানজ্যেরে পধ দেঘে দিবের।
মনে কয় মর-
অহ্রান মানজ্যেরে নুন্যেশীলো পানি খাবেবার
থামি যেইয়ে মানজ্যেরে উজেবার গীদ গেই-দিবের
স্ববন ন' দেখ্যা মানজ্যেরে দোল স্ববন দেঘেবার
পাদারা মানজ্যেরে র'ম'বানেই তুলিবের।
মনে কয় মর–
বেন্যা পোত্যা উধি বেঘরে জাগেবার
পেইক ওই গোদা এ পিথিমিয়ান ভঙী চেবার
ফুল বাগানর ফুল ওই তুম্বাজ ছিদিবের
দুক্যা মানজ্যেরে মন' কধা শুনি, তারাল্লোাই সুঘর কধা কবার।
মনে কয় মর–
রানজুনি ওই দেবাবোত পানি তুলিবের
মিধে সাঝন্যা বগা ঝাগত মিঝি ঘরত ফিরিবের,
রেদোর আগাজর তারা ওই ঝিমিত ঝামাত জুলিবার,
মেঘ' ছেরে লুগি পল্লাপল্লি খারা খেলেভার।

.....

* বিকেন চেগে, শিক্ষার্থী, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।

আয় ফিরি আয়
কলোরী চাকমা

দুঘ বানা, বানা দুঘ
দি যিয়জ মরে তুই
কোচপানা দেঘে দেঘেই
বজং গোরি দুওচ জীবনান মর
কোচপানা আরানা জ্বালা দিইনে
আদাপদে থোই যিয়ুজ
মরে তুই।
আহ্ঝা দি...দি...
কিত্যেই মারিলে পাজা?
জীংকানি মর ফেলেইদি গেলে
দুঘর কুল ন' পেইয়ে সাগরত।
সুঘর জীংকানি
কারি নিইনে
দুঘর জীংকানি দি গেলে।
কি আহ্ঝা দেঘিনেই
নুও গোরি কারে কায় নিইনে
গেলেগোই ফেলে
আন্ধার গায় গায় জীংকানিত।
ইদেক্কে আন্ধার ছারা ঘরত
ভারি দরাং মুই
কদক কানি কানি
কদক কোজলি গোরি ডাঘঙর
আয়, ফিরি আয়
ফিরি আয়, ফিরি আয়।

.....

* কলোরী চাকমা, দীঘিলানা, খাগড়াছড়ি।

মৃত্তিকা চাঙমা

লোগাংয়ান মর লোগাংয়ান

জু উধে ভিলি ধুন্ধ মিধেয়ান ফেইয়্যাত ভোরেব'
সিয়েন নয়, কন হেব তলাকানা যুদি অয়। এভ কি-
পিত্তা পিত্তি আমল নয় গোঙি গেল,আর'দ চেই আঘে
আমলান আমল আমল গোঙিব', তর মর বাম কুধু যেব লোগাংয়ান

মুই বেরাং পারে পারে কামায় কামায়
ধূল্যা কুর মুজুনো মাদি সেরে সেরে
কাঙারা গাদ তারেঙ আধা;
গজ্জং গাঝর তারুঙে বেলপুক দগরন
রিবেজ গুজুরে কান সুখ অহ্রিঙ্যা লোই অহ্রিঙি দগরন
বেল' সদগত অহ্নুমান্যা অহ্নুমানি কোচপানা আবুরন
তারুঙর পলাপলি ভাঝে ভাঝে ইহ্ধর রুমুজত
লোগাংয়ান মর। লোগাংয়ান

আমল বদল উই পুও ছা বলদন
নাদিন পুদিন লিখলিগেদন,দলে গুদিয়ে -
ইন্দি উন্দি তীর তাগজ সাঘা দোস হুচ ফেলাস
ছরা ইহ্ঝুস গুধুম মাছ বিজিরেস
চিগে সান ফুরমারচ কোরোলি চর-ন' লাগে
ইহ্ধত থোস,লোগাংয়ান মর,লোগাংয়ান।

হুচ্চ তর দি থেঙর জোঘা চেই,
এভেলা ওভেলা আহ্লেবার নেই
আহ্লেহ যুদি থাস থাংতিলেং থাং
মুজুঙত চেই আঘে ফের‍্যা ভিদিরে ধুন্ধ মিধে
ধেরদেরেই পরিব আঝায়ান বাচ্চেই আঘে।
ন'থারেই যুদি থেই থাস বাচ্ছেই থাক-
ইহ্ধত রাঘেস কারণ লোগাংয়ান মর।

ত' কেয়্যাত ম' কেয়্যাত লো নাল বেই যার এজ' যার
বো চা যেই বৌ আন্যায় কানাথ ওক বুগি ওক

তাদি ওক শুলগে নগবাজে ওক ধুরব' দিএ্যা-
লোগাংয়ান মর, লোগাংয়ান। কিত্যায় -
গদে গদ কোচপানা সত্রসান ভাবি-চা
এভ 'সং ইধোত আঘে নতুন চন্দ্র দারির এগস্যা বাঝর লুঙি বাচ
ফাল্গুনি ধুন্ধ মিদে তবাত ভরানা
বিরেশ চন্দ্র চোল মাবনির কামানী
তরনী ত্রিপুরা মরিজর কুল্যাং
মোস্যার চিদোল পঙা, সেরেয়্যা বৈদ্যর দারু তালিক
চান্ধ্যে বাপের সুগরী আলু ভেরা
থুত্যা মেম্বাস্যার মোজো শিঙর টুবির ধুম'
ভগা গাঞ্জা পিন্যা রবীচান গোপ্যর শিলুম বারাত
চিন্তে অহ্রণর ই পি আর বানিহ্ চালান দেনা।
ইয়েনি কার ব্যাগ লোগাংয়ান মর,লোগাংয়ান মর ।

সুম সুম ফেয়্যাব কিত্যায় চাগলক
ধুন্দ মিধেয়ান ঢুলু চুমত ভোরেই থ'
অক্ত মজিম দুবিবে হাস্য পাদা কুদিনে
আমলান মিধে ওই ফুধিব' লোগাঙর ধুরে ধুরে
মানুষ এভাক চেবাক মঝিবেক আমল ওই
তরমর কোচপানা ছিধিব' লোগাংয়ান মর লোগাংয়ান।

ইহ্ধাত আঘেনী কাপ্তেত গোধা দিলেক
ডুবিগেল ঘর পাদা ডুবি গেল আজু নানুর চিদেশালর নিজেনী
ডুবি গেল এঘর এঘর ভুই আহ্ঝার আহ্ঝার ঘরবারি
ডুবি গেল এ চাগালার ব্যাগ গুত্যা মঘচ্ছানি
চোগো পানিয়ে ডুবি গেল ঝিমিদত তর মর
আহঝি রঙর তান্ঝানি, বুগ পাদি আহ্ধ মেলে
লোগাংয়ান মর, লোগাংয়ান।

বজং বুঝানিত আহ্ধ মিলেবার যুক্কল ওইয়্যা
বন্জাম উরি এ্যাই দুওর মেলি দিএ্যা আহ্মেক্কন
উপেন্দ্র, মথুর' শফি, অহ্ংসধ্বজ,আশীষ,বিশ্ব মিত্র
কে এস প্রু, নকুল আন্দারত ধান কুজিদি
জীবন ভাঝেই দোন তত্যায় মত্যায় ব্যোগ
এপার ওপার। লোগাংয়ান মর লোগাংয়ান।

লোগাং আমার লোগাং (বাংলা অনুবাদ)

সুযোগ হয়েছে বলে রাফগুড়টা ব্যাগে ঢুকাবে
তা-নয়, কখনো যদি ফুটো হয়। সে অনেক -
বংশপরাক্রমের কাল না হয় কেটে গেল, আরো চেয়ে আছে
কালটা, বংশপরম্পরায় কেটে যাবে তোমার আমার
ভেলী কোথায় যাবে, লোগাং আমার লোগাং।
আমি ঘুরে বেড়ায় তীরে তীরে নদীর কিনারে
বালুচর, পলিমাটির ফাঁকে ফাঁকে
কাঁকড়া গর্তে, পাহাড়ের চূড়ায়;
গর্জন গাছের বনে বেলপোকা ডাকে
বনে দোলা উঠে মধুর কণ্ঠে হরিণ হরিণী যখন ডাকে
সাতসকালে হনুমান-হনুমানি ভালোবাসার কাছে টানে
অরণ্যের ঘন সবুজের ভাঁঝে হৃদয় উথলায়
বলে; লোগাং আমার লোগাং।

বংশ পরিবর্তন হয়ে উঠে বংশ বেড়ে উঠে
নাতি-নাতনী খিলখিলায়, দলবদ্ধ হয়ে -
এদিক ওদিক তীর ছুঁড়ো নিশানা দাও পা ফেলাও
ছড়া বাঁধ দাও গুধুম মাছ খুঁজে নাও

ছুঁচোর মতো দৌড়াও
স্মরণ করো লোগাং আমার লোগাং।
পায়ের ছাপ দু পায়ে মেলে দেখ
এখানে ওখানে তাকানো যাবে না
তাকিয়ে যদি থাকো চিৎপতাং
সামনে চেয়ে আছে ঝোলার ভিতর রাফগুড়
ঝরে পড়বে সময় অপেক্ষা রয়েছে।
নাই বা যদি দেখে থাকো অপেক্ষায় থাকো
মনে রেখো, কারণ-লোগাং আমার লোগাং।

তোমার আমার সবার শরীরে রক্তে ধারা বহমান এখনো -
বৌ চেয়েছি বৌ এনেছি কাঁধে কখনো পিঠে
রুদ্ধতায় পরামর্শে বাছাই করে বক্ষ উজার করে দেয়-
লোগাং আমার লোগাং। কেন -
একেক জনের ভালোবাসা ধুলোয় মিশে যায়, চিন্ত্মা কর-
এখনো মনে পরে নতুন চন্দ্র (দাঁড়ির) এগস্যা বাঁশের লগি
ফাল্গুনি চাংমার তামাকের গুড় পাত্রে ঢালানো
বিরাজ চন্দ্র চাংমার চাল মাপার কাঠের পাল্লা
তরনী সেন ত্রিপুরার মরিচের থুরুং
মোচ্ছ্যা চাংমার শিদোল পঙা
চান্ধ্যে বাপের মিষ্টি আলুর থুরুং
সেরেয়্যা বৈদ্যের ঔষধের তন্ত্রমন্ত্র
থুত্যা মেম্বারের মহিষ শিঙের পাইপের ধূঁয়া
ভগা গামছা পড়া রবীচান গোপ্যের শার্ট কাঁধে
চিন্ত্মা হরন চাংমা ইপিআর বন্দি চালান দেওয়া।

এ কার - সবই লোগাং আমার লোগাং
অনর্থক ঝোলাটি কেন নষ্ট কর
রাফগুড়টা দুলু বাঁশের চোঙায় রেখে দাও
সময় বুঝে তৈরী করে নেবে তামাক পাতা ছিঁড়ে
মধুময় আসক্ত হয়ে উঠবে লোগাঙের পারে পারে
মানুষ এসে দেখবে মজে উঠবে আসক্তি হয়ে
তোমার আমার ভালোবাসা বিলাবে, লোগাং আমার লোগাং।

মনে পরে কাপ্তাই যখন বাঁধ হলো
ডুবে গেল ঘর বাড়ি ডুবে গেল পিতৃপুরুষের শ্মশান ভূমি
ডুবে গেল একর একর ধান্য ভূমি হাজার হাজার ঘর বাড়ি
ডুবে গেল এ ভূমির সব মেধা শক্তি
চোখের অশ্রুতে ভরে গেল মুহুর্তের মধ্যে তোমার আমার
হাসি তামাসার মুহুর্ত, বুক চিড়ে হাত মেলে দেয়
লোগাং আমার লোগাং।

ভুল বুঝাবুঝির আবসানের চুক্তি হয়েছে
হেলিকপ্তার উড়ে এসে দরজা খুলে দেয় সর্বক্ষণ
উপেন্দ্র, মথুর', শফি, হংসধ্বজ, আশীষ
বিশ্বমিত্র, কে এস ধ্রু, নকুল চন্দ্র অন্ধকারে ধান রোপণে
জীবন ভাসিয়েছে তোমার আমার সবই-
এপার ওপার! লোগাং আমার লোগাং!

বিদ্রঃ উক্ত কবিতাটি ২০১৫ বিঝু প্রকাশিত বিভিন্ন সংকলনে কিছু তথ্য ও বানান ভূল থাকায় লেখকের বিশেষ অনুরোধে সংশোধন করে পূণঃ মুদ্রণ করা গেল।

.....

** মৃত্তিকা চাঙমা, শিক্ষক, মোনঘর উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙামাটি।*

Surat Kishor Chakma

O Zinghani

O Zinghani…. Dugor Zinghani..!!!

O Zingahani…… Dugor Zinghani,
O Zinghani……..Gorib duk-ke Zinghani!!

Hettei jormeyong e dugor Zinghaniloi,
Sogo-pani pawregi mawr amar nizor jadorloi!!

Chindegawrang Murrotun, Hoy nawarong bukottun,
Goom nawdre sogottun, baat nawroje pedottun,
Sogo-pani pawrregi sogottun jawkke edot udey chido murrottun!!

Sawng-nei Chakma-goon, pelapeli oyon bekkun,
Hoda dora-dori nei chakma-oon, sida-sidi oyon bekkun,
Monot dukh udeygoi morutton, jawkke edot udey chidotun!!

Babidung sigon-sigon beybonoon, babidoong ebak-ke din-oon,
Hengeri hebak jaat beybonoon, murijebawngoi ami dangawroon,
Bookk-ko jawle boogotun, Jawke-ke edot udey chidotun!!

O Zingahani…… Dugor Zinghani,
O Zinghani……..Gorib duk-ke Zinghani!!

.....

** সুরত কিশোর চাকমা, সংস্কৃতিকর্মী, ভারত।*

চাঙমা গীত

চন্দন চাকমা

ভুলংতুলি মোন

ভুলং তুলি মোনো মাধাত
চলে বুদ্ধ মেলা
মোক্যা দারি দোল চুলান
গুভুর মেলা।
চিগোন চিগোন রঙ তামাঝা, নিয়ন
বাত্তির ঝিক ঝাক
নুও গিরিত্তির পিলে ছাচ
ও নুও, মেলা
চলে বুদ্ধ মেলা॥
ছরা থুমত গধা দিনেই
লামি এজে ভেলা
ফাদা বাঝর দুলুককানি
চাদে বেঙা কঙা
চলে বুদ্ধ মেলা॥
ধুব মেঘ' সেরে সেরে
আজুর যেইয়্যা বেলান
বেজুর আমি ন' থেবং
থেদং নয় জনমান
চলে রেদো মেলা॥

চুংকু চাকমা

ফুল বিঝু

ফুল বিঝু দিনত এভে মর মুজুঙত
কি তর আল্যাং বিঝুত মুই গোঝি লোম
যুদি তুই এযস মনান মর খুঝি অধ'
এই বিঝু দিনত এভে মর মুজুঙত
তুই যুদি এযস এই বিঝু দিনত
বেরেবং সমারে বিঝু খেবং দ্বিজনে
গোরিবং দ্বিজনে কাদেবং সমারে
কধা দোস এভে কয়োস বিঝু সমারে
কধা দিনে কধা ন' রাগেলে এই বিঝু দিনত
যুদি তরে ন' দেঘং পানি ডুবি মরি যেম
কধা দোস এভে কয়োস বিঝু সমারে
কিত্যা তুই ন' এলে এই বিঝু দিনত
কধা দোস এভে কয়োস বিঝু সমারে
কধা দিনেই ন' এলে এই বিঝু দিনত।

.....
** চুংকু চাকমা, শিক্ষার্থী, রাঙামাটি।*

.....
** চন্দন চাকমা, গীতিকার ও সংগীতশিল্পী।*

কিশলয় চাকমা

চুবে চুবে কোচপানা

চুবে চুবে কোচপানা কোই সাং কানে কানে
তারে - ন' দেলে তারে ন' পেলে
এই মন ন'-দ' মানে ॥

মিধে ঘজায় ভাগি যার দূর' বাঝিব'
মন' বাঝি ডাগি যার তা- আহ্ইঝব'
সে আহ্ঝিয়েন মর স্ববনান
স্বর্গর সুগ যেন আনে
এই মন নং দ' মানে ॥

রাঙাকালা, এ্যাইল-সোজ ধুবে রঙে
কাদি যোক জীংকানিয়েন রঙে ধঙে
মন-দ' তারে পুরি ফেলেই-ন' পারে
তারে-দ' সদর জানে
এই মন ন'-দ' মানে ॥

কিকো দেওয়ান

জীংকানি

জীংকানিত কি আঘে তুই বাদে
যায যুদি দুরত ফেলেই,
অং মুই দিককাবুল
ন'যেম মুই কধা দোওং তরে
গোদা দিন নিত্য ধাগধাক্যা
থেম তুই ছারা ওইনে।
মনান দ' ন' মানে ভাবং ত' কধা।
দুরত গেলে বারে জ্বালা
লাগে মনত দর যুদি কি অয়
বন অয় মর আহ্ধানা
দিম্মানে অয় দেঘা তুও মনে অয় গাই গাই,
মনান চায় আর' কায় কুরে থেবার
ঘুম নেই চোগত রেদত জাগি থাং
আন্ধারত তরে ঘেং,
বানাহ্ কুরকুজ্যে তুই মুই আঘি
তার পরেও কিচ্ছু নেই।
জীংকানিত কি আঘে তুই বাদে
যায যুদি দুরত ফেলেই,
অং মুই দিককাবুল।

.....
** কিশলয় চাকমা, বিশিষ্ট কবি।*

.....
** কিকো দেওয়ান, শিক্ষার্থী,রাঙামাটি।*

বিপম চাকমা

দিগবন' সেরেত্তুনঃ মনের খাঁচায় বন্দি পাখির আর্তনাদ

"দিগবন' সেরেত্তুন" অর্থাৎ সম্মোহনের ভিতর থেকে কবি মৃত্তিকা চাকমার লেখা একটা কাব্যগ্রন্থ। বইটি ১ম প্রকাশের (১৯৯৫)পর থেকেই কিনবো কিনবো করে অনেকবার লাইব্রেরিতে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখেছি কিন্তু 'থাক,আজ না আরেক দিন কিনবো 'এই করতে করতে আর কেনা হয়নি। শেষ পযন্তর্ম্ম স্বয়ং কবির কাছ থেকে একটি সৌজন্য কপি হাতে এসে পৌঁছাল। একটু অবাক হলাম কারণ কারও থেকে সৌজন্য কপি পাওয়ার মত এতো গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি এখনও হয়ে উঠতে পারেনি।

যাক বইটি হাতে পেয়ে পড়তে বসলাম। সূচিপত্রের পরের পৃষ্ঠায় ''দ্বিতীয় সংস্করণের কথা'' লেখক যে মুখবন্ধ লিখেছেন সেটা পড়ে দ্বিতীয় বার অবাক হলাম। বা চাকমা ভাষায় লেখা একজন কবি কাব্যগ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। বিষয়টা কিছুটা যেন অচিন্ত্যনীয় এবং ঐতিহাসিকও। চাকমা সাহিত্যর সৃজনশীল শাখায় কোনও লেখকেরই বই দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

এখন কথা হচ্ছে ধান ভানতে শীবের গীত গাওয়ার মত গ্রন্থ সমালোচনা করতে বসে এ প্রসঙ্গের অবতারনা কেন? এর জবাবে বলি-আমার মনে হয়েছে চাকমা ভাষা লেখা একটা কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে ব্যাপারটা কিছুটা অবিশ্বাস্য।

যেখানে নিয়মিত কাব্যচর্চা করেন এবং কবিতা বই বের হয়েছে এমন কবির সংখ্যা নগন্যই নয়, অতি নগন্য। সেখানে কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হওয়ার ব্যাপারটা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। আশা করি ইতিহাস একদিন এর মূল্যায়ন করবে।

চাকমা ভাষা ''দিগবন' 'শব্দের অর্থ সম্মোহন বা মানসিক ভাবে শৃঙ্খলিত করা। বিশ্বাস প্রচলিত যে, অজগর সাপ শিকারে পিছু পিছু তাড়া করে কখনও শিকার ধরে না। শিকার কাছে চলে এলে শিকারকে সম্মোহিত করে তারপর গিলে ফেলে। অজগর সাপের সম্মোহনের ফলে শিকারের এমন অবস্থা হয় যে, সে সম্পূর্ণ চলৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে আর কোথাও পালাতে পারে না। এমন কী কোন ধরনের আওয়াজ করতে পারেনা। সমস্ত ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে শিকার সাপের খাদ্যে পরিণত হয়। এখানে ''দিগবন' সেরেত্তুন'' কাব্যগ্রন্থে এক অর্থে আমরা সকলে এই মানসিক শৃঙ্খলে বন্দী।
যে চাকমা জাতি অতীত ইতিহাস শৌর্য বীর্যের,বীরত্বের যারা এককালে রাজ্য জয় করতে করতে চম্পক নগর থেকে সুদূর মগরাজ্য অর্থাৎ বার্মা পযর্ন্তম্ব পৌঁছে ছিল আজ তারা শুধু

রাজ্য হারাই নয় হারিয়ে ফেলেছে তাদের আদি চম্পক নগরের অবস্থানও। এখন আর কেউ জানে না সেই চম্পক নগর কোথায়। যে চট্টগ্রাম শহর তাদের শাসনের ছিলে সেই চট্টগ্রাম শহরকে তাদের পিছনে ফেলে চলে আসতে হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় তাই কবির দীর্ঘশ্বাস-

চম্পক নগর চম্পক নগর কুধু আঘস?
থান-দ পাজ তুই অহ্লে আমা পরান আমা বিজগ।

(চম্পক নগর চম্পক নগর কোথায় আছ?/তুমি জান তুমিই আমাদের প্রাণ আমাদের ইতিহাস)

তবে কবির এই দীর্ঘশ্বাস মনে হয় সাময়িক। কবিতার পংক্তিতে উত্থিত হয়ে আছে লড়িয়ে কবির উদ্বিত হাত। কিন্তু এই হাত ঠিক শপথের তেজে মুষ্ঠিবদ্ধ নয়। বিদ্রোহের শক্তিতে শক্তিমান নয়। এই হাত আহবানের। যেমন-

আভা কধা ফেলেইদি জাদ সত্য তোগেই চেই
ভালেত অভালেত তাগ তুগ ফেলেদিই-
চম্পক নগর কুধু আঘে, কিঙিরি আঘে রেনী চেই
এয ' বেই ছিনে যেই শিগোলোর হারুয়ান।(চম্পক নগর)

(শ্রুত ভাষ্য ছুঁড়ে ফেলে জাতি সত্য খুঁজি/ভালো মন্দ টুকি টাকি ছুঁড়ে ফেলে-/
চম্পক নগর কোথায় আছে, কেমন আছে দেখ চেয়ে/এসো ভাই ছিঁড়ে যাই বন্ধ শৃঙ্খল।)

চেই-ল জাগি-ল বোলি হারা চেইয়্যাউন।
এবার আলসি নয় থির গোরি থিয়েই-য'
জনে জনে বল হিঝি খারাত লামি-য'
দি দাবানা লোই আহ্ধে থেঙে পেজ-দি
যুওদ লাঘত প'চিদোর গোরি- ল'
কধা-ক' বোলি কধা-ক'।(উদ বোলি তুই)

(দেখো ওঠো হে কুস্তি লড়িয়ে যারা/আলস্য নয় আর দাঁড়াও থির/প্রতিজন নামো ময়দানে/দুই উরু সহ হাতে করে যাও/কথা বল বীর কথা বল।)

কুধু আঘ' চাদিগাঙ ছারা পাদুরো মানেই
আর দোরেবার নেই উধি এয ঝিমিদত
ফিবেক দিএ্যা যেই কালা বাক।(মালোস)

(কোথায় আছ,চট্টগ্রাম ছেড়ে আসা ভীতুর দল/আরতো ভয়ের কিছু নেই সহসা উঠে এসো/প্রতিরোধে যাই কালা বাক)

পদ দুও তারারে,জাঙারান কাজা যোক
পত্তান ধুও ওই উধোক ,
সক্কে লাগিলে বেক্কুনে আহ্ধিবঙ

তুও আঝা আঘে
আমি সক্কে আধিবঙ,
এ-মাদিত ভহ্র-দি আমি কথা দিলঙ।
(তাদের যেতে দাও নোংরা ময়লা ধুয়ে মুছে/রাস্ত্মা সাফ হোক/তখন না হয় হাঁটবো সবাই/তবু আশা আছে/আমরা তখন হাঁটবো/এ মাটির কসম আমরা কথা দিলাম/
উঝ অহ্।
কোই লঙর থেঙর হুচ ফেলেবা বুঝিনে।
(এভাক্কে সিনিউর উধিজে)
(জেগে ওঠো/বলছি পদক্ষেপ ফেলো দেখে শুনে)

এই কবির আহবান,এতে আগুন নেই কেন? আমাদের মনে রাখতে হবে কবি কথা বলছেন "দিগবন' সেরেত্তুন" অর্থাৎ সম্মোহনের ভেতর থেকে" সম্মোহিত হওয়া আর শারীরিক ভাবে শৃঙ্খলিত থাকা বা বন্দি থাকার মধ্যে তফাৎ আছে।

সম্মোহিত হওয়া মানুষ শারীরিকভাবে শৃঙ্খলিত থাকে না কিন্তু মুক্ত থাকলেও শরীরের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রন থাকে না। অন্যের ইশারাতে সে হাঁটা চলা সহ সমস্ত্ম কাজ কর্ম করে যায়। সে হয়ে যায় অন্যের হাতের ক্রীয়ানক।

কবি স্বীকার করেছেন তিনি লড়িয়ে আর লড়াই করে যাওয়াই যার ধর্ম।

-মুই লরবো লরানা মর জনম্মো। (দিগবন' সেরেত্তুন) এই লড়িয়ে এখন কী অবস্থায় আছে? কবির ভাষায়-

হালিক ইরুক আর নেই মুই লোরবো
আহ্দি-ন' পারঙ তোরবো
মেলিবের চাঙ মেলি-ন' পারঙ তদাবো
কারণ ওই আঘঙ দিকবন' ইধ শক্তি মান শক্তি
কিচ্ছুই নেই বানা মুই এ্যালে-লেয় চেই আঘঙ।

(কিন্তু এখন আর আমি নই লড়িয়ে/হাঁটতে পারি না পায়ে/বলতে চাই খুলতে পারিনা গলা/কারণ হয়ে আছি সম্মোহিত আর্তশক্তি বাকশক্তি/কিছুই নেই শুধু অপলক চেয়ে আছি) শারীরিকভাবে শৃঙ্খলিত মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলেও করতে পারে প্রতিবাদ চিৎকার করে জানাতে পারে তার আকুতি। কিন্তু সম্মোহিত মানুষ? সে তো মুখ থেকে আওয়াজ বের করতে পারে না।

আজকে আমরা সম্মোহিত কেন? এর কারণ কি?
কবি বলেছেন-
মনর পেরগা ঘেরেঙ বানি আঘে, নিজ কেইয়্যাত। অর্থাৎ-মনে ময়লা জমে আছে দেহের স্ত্মরে স্ত্মরে। (মাত্তল যাত্রা দোলী)

তাই তো আজকে আমাদের অবস্থা-
তানা অহ্র নিজ মাদার চুল নিজে
উগুরি গেলে কিত্যাই উগুরি যার-দারু কধা উধে
বোলি অহ্লে এধক বোলি-কিজিক তোগান
কাঙুরো অহলে হোম্বিস,তাগপোয্যা অহ্লে হোম্বিস
এ্যানকি লাম্বা-বাদি অহ্লেও হোম্বিস।
সালেন কি অভ'? কন জোপ নেই।
বানা জাগলুক আজুরনা কারর নেই।(মাত্তল যাত্রা দোলী)

(টানছি নিজ মাথার চুল নিজে/উঠলে কেন উঠছে ঔষধ খুঁজি/ঘন হলেও কেন এত ঘন খুঁজে ফিরি কাঁচি/কোঁকড়া হলে সন্ত্মাপ, টাক পড়লেও/এমন কি ছোট বড় হলেও সন্ত্মাপ/তাহলে কি হবে? কোন জবাব নেই/শুধু এলোমেলো, গুছিয়ে রাখার কেউ নেই।)
কবি জেনেছেন আজকের এই সম্মোহিত অবস্থার কারণ। নিজের মনের জমে থাকা অন্ধকার ময়লাই এর কারণ। এই অবস্থা থেকে তিনি বাঁচতে চান। তাঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে বাচাঁর সুতীব্র আঁকুতি।

বাজিদুঙ চাঙ মুই মরে রোক্ক্যা গর।
মুই লোরবো লরানিত দাগিকোম
আদাম্যা পারাল্যা দুনিয়ের মানেই লক
দিগবন' সেরেত্তুন মরে উদ্ধার গর'মরে উদ্ধার গর'। (দিগবন' সেরেত্তুন)

(বাঁচতে চাই আমাকে রক্ষা কর। লড়িয়ে আমি লড়াইয়ে ডেকে বলবো পাড়া প্রতিবেশী দুনিয়ার মানুষ সম্মোহনের ভেতর থেকে আমাকে উদ্ধার কর, আমাকে উদ্ধার কর।)

সুতরাং সম্মোহনের ভেতর থেকে তিনি যে বাঁচার জন্য আর্ত-চিৎকার দিতে পেরেছেন এটাই আশার কথা।

.....
** বিপম চাকমা, উদিয়মান সংস্কৃতি কর্মী।*

চিত্রমোহন চাকমা

শুভলগ্নে

ষোলই মাঘ কনকনে শীতে
কুয়াশায় ঘেরা নিঝুম নিস্ত্মব্দ রাতে
বিছানায় রয়েছি শুয়ে ঘুম হারা হয়ে
কত কিছু ভাবি....
কোথাও বসেনা আমার চঞ্চল উদাসী মন
কখনো ছুটে যায় সেখানে রয়েছে কল্পনার ভুবন
এতে উদয় হলো হঠাৎ তখন.....
হারানো দিনের উৎসব মুখর বিঝু স্মৃতির প্রেক্ষাপট
বসন্তেম্বর আগমনে স্নিগ্ধ মধুর মলয় সঞ্চারনে,
গজিয়ে উঠে নবীন পাতা যত সব বৃক্ষ সমুহে।
দিকে দিকে ফুটে ফুল...
নাগেশ্বর রজনীগন্ধা গন্ধরাজ
দোলন চাপা ভুইচাপা আরো কত।
থামে না তখন.....
ভ্রমর মক্ষিকার শ্রুতি মধুর গুজন
কোকিল গেয়ে যায় ক্ষণে
মিষ্ঠি মধুর কণ্ঠে কহু কহু সুর তুলে।
দিন দুপুরে গাছের ছায়ায় সমবেত হয়ে
কিশোর কিশোরীরা খেলে কত ঐতিহ্যবাহী খেলা
পক্ষে বিপক্ষে অংশ গ্রহন করে
হেসে খেলে মনের উল্লাসে কেটে যায় সারাবেলা
হয়ত কখনো রাতে
চাঁদের আলোয় মাচাং ঘরে বসে
শুনে চান্দবী বার মাস চিত্ররেখা বার মাস হয়ত বা
ধাঁধাঁ কৌতুক করে পরিবেশন
দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে সেই উল্লাস মুখর বিঝু
প্রথম ফুল বিঝুর দিনে
উষার শুভ লগ্নে পাখির কলতানে
ঘুমের নেশা কাটিয়ে

বালক বালিকারা ফুল তুলে ছুটে যায় নদীর ঘাটে
সেই ফুল ভাসাতে নদীর স্রোতে
ফুল বিঝুর পরে মুল বিঝুর হয় আর্বিভাব
ঘরে ঘরে থাকিবে সেদিন কমবেশী মদ জগরা
আরো পাজন সেমাই অনেক জাতের পিঠা
সাধ্যমত আরো অন্য কিছু
সেদিন হিংসাদ্বেষ ভুলে সবে
বিভেদহীন মৈত্রীর বন্ধনে নাচে গানে উল্লাসে
মুখরিত করে তুলবে সারাক্ষণ
সেই বিঝু আর কত দিন
বিঝু পাখীর আমন্ত্রনে কোকিলের কুহু টানে
চৈত্র সমাপনে-উষার পুর্বাভাসে
সে দিনই---
শুভলগ্নে আবার আসিব ফিরে।

.....

** চিত্রমোহন চাকমা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি।*

অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা

স্বর্গের কাছাকাছি স্বর্ণচূড়ায় আরোহণ

স্বর্গ জাগতিক বিষয় নয়, স্বর্গ পারলৌকিক বিষয়,
স্বর্গ জয় ধর্ম্মের পারমি পূরণে, কিন্তু স্বর্ণ-লাভে কঠোর পরিশ্রমে।
মানব খনির দেশ বাংলাদেশ, অসম্ভব বলতে কিছুই নেই তার কাছে,
কেবল মনন, মেধা, শ্রম ও একাগ্রতা তার চলার পাথেয়।
পৃথিবীতে বাংলাদেশীরাই পারে দুর্বার গতিতে জাগ্রত হতে,
অসম্ভব বলে কিছুই নেই তার পক্ষে-পৃথিবীর আনাচে কানাচে থাকতে।
থাকবে না এককালের 'বাঙ্গাল'-বলে কুঁ বাক্য আর কু নজর!
বর্তমান নেতৃত্বধারা থাকলে, মানুষের মাঝে মানবতাবোধ থাকলে
কখনও থাকতে পারে না পিছিয়ে এ জনজাতি পৃথিবীর দরবারে।
দিনে দিনে পৃথিবীকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছে যে যার ক্ষেত্র থেকে,
ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে, কি খেলায়, কি রাজনীতির নেতুত্বে,
কি বিশ্বের রাজসভায়, কি জাতিসংঘে নেতৃত্ব দিতে সাহসী হয়ে
উঠছে খুব দ্রুতগতিতে এ বাংলাদেশের দুর্বার মানব সৈনিকেরা।
শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কৃষিতে, সমুদ্র বিজয়ে, জাতিসংঘের গুরত্বপূর্ণ শীর্ষাসনে
কিংবা গোলাগুলির সুনিশ্চিত মরণে সাহসীরূপে যুদ্ধে দাঁড়াতে।
মানব সম্পদে ভরা এ বাংলাদেশ- সেদিন আর বেশী দূরে নয়,
যে দিন পৃথিবীব্যাপি ঝাঁপিয়ে পড়বে বাংলার যুবারা,
যেখানে চষে বেড়াবে এ প্রান্ত থেকে গোলকের অপর প্রান্তে।
পৃথিবীর ১৫০ ভাষাভাষি থেকে ১০০ জাতির ভাষা রপ্ত করে
মানবতায় শিক্ষিত হয়ে, মানবতার সেবায় নেমে পড়বে।

.....

** অজিত কুমার তন্‌চংগ্যা, বিশিষ্ট কবি ও সমাজকর্মী, রাঙামাটি।*

সজীব চাকমার তিনটি কবিতা

(১)

অপেক্ষায়

দুঃসহময় সময় কেটে যায় নিঃসঙ্গতায়
রাঙা রাঙা রোদগুলো ভীষণ ঘামায়
সবুজ পাহাড় একমাথা মেঘ নিয়ে চুপচাপ
বিষণ্নতাভাব!
বহুদূরে ক'টা কুটির বৃক্ষ পাড়ায়
ন্যুব্জ পথ নিয়ে যায় হিরোশিমায়
সময় কেটে যায়...

সভ্যতা ভাবায়, তাড়ায়, সুড়সুড়ি কাটে
বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যায় সেন্ডেল আর জুতোয়
ভালোবাসাগুলো হোটেল আর ক্যান্টিনে অপেক্ষায়–
তৃতীয় পাড়ায়।
সময় কেটে যায় সসংকোচে সন্তর্পনে
জোয়ার ও ভাটায়,
সময় কেটে যায়
একটি সময়ের অপেক্ষায়...

(২)

একটি স্বপ্ন

চতুর্দিক কঠিন প্রাচীর
স্বাধীন নীলাকাশ এখানে নেই
নেহাত একটুকু দরোজা–
লোহার।
তাও কী ভীষণ ভয়
কখন যে খোলা হয়।

এখানে আলো নেই
এখানো সৌন্দর্য নেই
এখানে কোন জনপদ নেই;
শুধু দানবের আগমন মাঝে মধ্যে।
এখানে প্রকৃতি নেই
এখানে পাখির স্বাধীন ছুটোছুটি নেই
এখানে আমার দেশ নেই
মা-বাবা নেই
ভাই-বোন নেই
নেই সেই হাসিটাও,
আছে শুধু একটি স্বপ্ন
স্বাধীনতার স্বপ্ন।

(৩)

মৃত্তিকা

যদিও আমি মৃত্তিকা
তবু আমার আশায়
আকাশকে পাবার প্রবল আকুলতা,
নির্মাণ করে চলি দিগন্তের নিবিড় ভালো
যদিও দেখি প্রচুর ব্যবধান
তবু আমার হৃদয়ের সব স্বপ্ন,
জলীয় আবেগ আর কল্পনায়
রচনা করে চলি মেঘের সেতু।

যদিও আমি মৃত্তিকা...
জানি আমি মৃত্তিকা, কোনদিন
পাবো না আকাশের নিবিড় ছোঁয়া,
আর এও জানি–
দু'মেরুর অদৃশ্য দেয়াল
তবু আমি এর দ্রষ্টা হতে চাই।

যদিও আমি মৃত্তিকা
ভরাট করতে পারবো না
অনন্ত্ব আকাশের আশা
তবু আমি প্রতিনিয়ত
জন্ম দিয়ে চলি প্রচুর জীবন।

যদিও আমি মৃত্তিকা
পাবোনা অনন্ত্ব আকাশের নক্ষত্রগুলো ছুঁতে
তবু আমি রচনা করে চলি অবিরাম
মহৎ ফুল আর
প্রকৃতির অতুলনীয় সৌন্দর্য।

.....

** সজীব চাকমা, কবি ও সংস্কৃতিকর্মী, রাঙামাটি।*

লালন চাকমা

কাঁদে মন কাঁদে প্রাণ

জননী , জন্মদাত্রী সেতো সৃষ্টির লীলাখেলা
একই গর্ভে লভি সন্ত্মান , করে না হেলা ।
অকৃত্রিম স্নেহ চুম্বনে করায় দুগ্ধপান
দেখিলে সন্ত্মানের মুখ , জুড়ায় মনপ্রাণ ।
মাতৃত্বের কাছে কোনোকিছু , থাকে না বিভেদ
বিকলাঙ্গ কিংবা তনুশ্রীর ভালবাসা এক ।
রাষ্ট্র তুমি কেন মাতৃরূপী নও ?
প্রজার সেবাযত্নে, সদা অকৃপণ হও ।
সংবিধানে লেখা আছে , সবার সমানাধিকার
জন্মসুত্রে নাগরিকত্ব ,নেই তুলনা তার ।
ঘুচে যাক জাতি , ধর্ম ,গোত্র গর্ব কথা
এক পতাকাতলে সমবেত হই ,গড়ি একতা ।
রাষ্ট্র তুমি দেখেছো পঞ্চদশ সংশোধনী
লঘিষ্ঠ সন্ত্মানের নাম রেখেছো ,ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ।
নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায়, না থাকুক ব্যবধান
আইন মেনে চলে, গাহি সাম্যের গান ।
মা, মাতৃভাষা , মাতৃভূমি সবই প্রকৃতির দান
রাষ্ট্র নিশ্চয়ই রক্ষা করবে , সবার যথার্থ সন্মান ।

.....

** লালন চাকমা, কবি, মারিশ্যা, রাঙামাটি।*

রিপরিপ চাকমা

গোলাপের দুঃখ

আমার বাগানে ফুল ফুটে ছিল
যে দিন তুমি করে ছিলে আগমন
ফুল গুলো কেঁদেছিল সে দিন
যে দিন তোমার গমন।
গোলাপটি সাজ সজ্জা করেছিল খুব
তুমি নেবে বলে
কিন্তু হায়! দুঃখ রয়েই গেল তার
কেন নাওনি তুলে।
গোলাপটি আমায় বলেছিল-
আমাকে সবাই ভালবাসে
দু'হাতে স্পর্শ করে তুলে নেয়
তবে কেন সে নিল না আমায় ?
তার এত কিসের অহংকার ?
কদম,শিউলি,জবা সবাই হাসে
ধন্য ধন্য করে তোমায়
শুধু গোলাপ বিষন্ন মুখে বসে থাকে।
কদমটি চুলের খোঁপায় নিয়েছিলে তুমি
তাই হাসতে হাসতে খুশিতে নূয়ে পড়ে
ঝক ঝক করে মুখ।
গন্ধরাজ খুশিতে বাতাসে দোল খায়
গুণ গান গায় তোমার,
রজনীগন্ধার সাথে গল্প করে
অনাবিল বেলি।
এদিকে গোলাপের মনটা
আরও খারাপের দিকে ধাবিত হয়,
দুঃখ লাগে আমারও।
কারণ গোলাপ আমার বাগানের ফুল
যে বাগান আমি তিলে তিলে গড়েছি।
আর দুঃখ নয়,
উপহার নাও এক গুচ্ছ লাল গোলাপ
শান্ত্ম হোক দু'টি মন
মুছে যাক বিষাদ ময় বেদনা ॥

.....

** রিপরিপ চাকমা, কবি, খাগড়াছড়ি।*

নমদীশ চাঙমা

মানুষের সমাজ গড়া

নারী পুরুষ মিলে হয়; সমাজের সংসার
মানুষ বুঝিতে পারে তখন, জীবনের আধার।
স্বামী, স্ত্রী হয়ে যে করে সমাজের বন্ধন,
তখন হইবে মানুষে দুঃখের কারণ।
জম্মাবে ছেলে আর মেয়ে,
বড় হবে মাতা পিতা আদরে।
পাইবে একটা না হয় একটা,
পরিবার ভিতরে।
ভাল হয়ে জম্মায় যদি,
হইবে সমাজের নেতৃত্ব ধারী।
মন্দ হয়ে জম্মায় যদি,
হইবে সমাজের কলঙ্ক ধারী।
যদি থাকে মাতৃ পিতৃ কোন কুলে।
ভাল সমাজ ভাল ছেলে আর মেয়ে,
পরিবারে করতে হলে,
বংশের ভাল মন্দ, শিক্ষিত অক্ষিত,
কোন সমাজের দেখতে হবে।
না, হয় পড়িবে সংসারে আধার।
নারী পুরুষ মিলি, সমাজের সংসার।

.....

** নমদীশ চাঙমা, কবি ও সমাজকর্মী, পানছড়ি।*

রূপেন্দু বিকাশ চাকমা

২০০০ সালের পাংখু পাড়া

পার্বত্য চট্টলার পূর্ব প্রান্তরে,
সুফলা, সুজলা প্রকৃতির ভরপুরে,
কতিপয় পাংখু আদিবাসী বুকে নিয়ে
রাংঙ্গামাটি থানাধীনে সুউচ্চ পর্বতে আমার ঠিকানা।
শতাব্দী বছর ধরে, রয়েছি নীরব নিস্তব্ধে
বন জঙ্গলের ঘেরার ভিতরে।
সকাল বিকাল বন্যপাখীদের আনন্দের কলরবে
মেঠে উঠি ক্ষণিকের আনন্দে।
এভাবে চলি সারা জীবন ধরি।
কিন্তু ১৯০০ সাল বিদায়ের প্রাক্কালে
২০০০ সাল আগমনের উপলক্ষে
হঠাৎ মোর বুকে বেজে উঠল আনন্দের উল্লাস।
হয়ে গেল সর্ব স্তরের লোকের লোকারণ্য
শিল্পীর যন্ত্রের বাজনার ঝংকারে পূর্ণ।
শিল্পীর কণ্ঠে, যন্ত্রের ঝংকারে ও জনতার চলার গতিতে
মুখরিত হলো আমার বুকের অরণ্য।
ভূতুরে অন্ধকার, বিদ্যুতের আহ্লাদে আলোকিত হলো
নিস্তব্ধ হলো শতাব্দীর দুঃখ বেদনা
জেগে উঠল নুতন জীবনের কল্পনা ও প্রেরণা।

.....

** রূপেন্দু বিকাশ চাকমা, কবি, জুরাছড়ি।*

রিমি চাকমা

জোনাকি

জোনাকিরা দুপুরে ভাবে
কখন সন্ধ্যা আসবে।
জোনাকিরা রাতে ভাবে,
যেন আর দুপুর না আসে।
জোনাকিরা রাতে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়
তখন পৃথিবীটা আশ্চর্য সুন্দর দেখায়
জোনাকিরা যখন রাতে করে খেলা
আকাশে বসে তখন তারার মেলা
জোনাকিরা যখন রাতে মিটি মিটি করে জ্বলে
আকাশের তারারা তখন হেসে কোনো কিছু বলে।
রাত যত গভীর হয় জোনাকিদের আনন্দের প্রহর শুরু হয়
যখন রাত শেষ হয়ে ওঠে
জোনাকির মনের দুঃখের ঘন্টা বেজে ওঠে।
আর রাত শেষে যখন ভোর হয়
জোনাকিদের রাতকে বিদায় দিতে হয়।

.....

** রিমি চাকমা, উদিয়মান কবি, জুরাছড়ি।*

রাজা পুনিয়ানী

শিলিগুড়ি তুই কত আর পাল্টাবী

'শিলিগুড়ি পাল্টে যাচ্ছে'
বলেছিলো যারা এককালে
কি পাল্টিয়ে দিতে পারল তারা
উত্তপ্ত গ্যারেজের ফীটার পোল্টুর গায়ের ঘামকে
এই বাড়ি সেই বাড়ি দৌড়িয়ে যাওয়া কাজের মাসির মাথার রেখাগুলি
ব্যস্ত ভেনাস মোড়ের ট্রাফিক কন্সটেবালের সারা দিনের ঘামমাখা হাতের ইশারাগুলিকে
মহানন্দা ব্রীজের মুখে হ্যান্ডবীল বিতরণের জন্য সকাল থেকে দাঁড়িয়ে বিপ্লবদার কুণ্ঠাকে

পাল্টাল অনেক কিছু
পাল্টাল ঘরবাড়ি
ঘর ফ্ল্যাট হয়ে গেল
মাঠগুলি শপিঙ মল

পাল্টে যাচ্ছে কবিতার গ্রাফ
পাল্টে যাচ্ছে মনের গান
পাল্টে যাচ্ছে ছেলের রাস্তা
পাল্টে যাচ্ছে মেয়ের চোখ
পরিবর্তন কি এমন ভাবে মুখোশ পড়ে আসে
কোনটা মুখোশ কোনটা মুখ
দিনের সবুজ রোদও লাগে যেন ল্যাম্পষ্টের আপছা আলো

শিলিগুরি কত যে পাল্টাল
তোর সেই উত্তরের ঘায়ের রঙ
এবার সত্যি সত্যি বল
শিলিগুলি তুই কত আর পাল্টাবী

.....

** রাজা পুনিয়ানী, দার্জিলিং, ভারত।*

ঝর্ণা চাকমা

হে শুভ বিঝু

হে শুভ বিঝু
নব বসন্তের কুহু তানে
বিঝু পাখীর আমন্ত্রনে
বিঝু আবার আসিবে ফিরে
রূপের মাধুরী নিয়ে।
বরণ করিবে সেদিন সবে অর্থ দিয়ে
আমোদ উল্লাসে বিমোহিত প্রাণে
ভুলে যাবে সবে হিংসা দ্বেষ বৈষম্য।
সুভাসিত ফুলে আর নবীন পাতায়
কেউবা সজ্জিত করিবে নিজেদের বসত বাড়ী
প্রতি ঘরে ঘরে করিবে আয়োজন
মদ জগরা সেমাই পাজন পিঠা
তরমুজ লাল আলু আরো কত কিছু।
দুয়ার খুলিয়া রাখিবে সবে
সর্বজন করিতে আপ্যায়ন।
আধ বুড়ো যুবা কিশোর শিশুরা
ঘুরিবে ফিরিবে সারা বেলা।
থামিবে না সেদিন
নাচে গানে কৌতুকে হাসির কল্লোল
উৎসব মুখর হয়ে উঠিবে গ্রাম, শহর।
হে শুভ বিঝু
আড়ালে থাকিওনা আর।
সবে রহেছি তোমার প্রতীক্ষায়।

.....

** ঝর্ণা চাকমা, উদীয়মান কবি, শুকনাছড়ি।*

পরেশ চাঙমা

হিল চাদিগাঙ

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান
এই তিনটি জেলা মিলেই
মোদের হিল চাদিগাঙ।
তিন জেলাতেই আছি আমরা
এগার' ভাষার চাষি,
যুগ যুগান্তর হয়ে আমরা
নামে জুম্ম জাতি।
আমাদের আছে সংস্কৃতি, আছে এতিহ্য
অধিকার ছাড়া চাই না মোরা
বড় স্ত্রামাজ্য।
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নই আমরা
পূর্ণ একটি জাতি।
দেশ বিদেশে ছড়িয়ে আমরা
যেই জাতি-
জুম্ম জাতি, জুম্ম জাতি, জুম্ম জাতি।

.....

**পরেশ চাঙমা,শিক্ষার্থী, দীঘিনালা।*

বরদেন্দু চাকমা

সাহানা দেওয়ান

আমার মনের দেয়ালে লটকে আছে এমন একটি নাম,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
তিনি আমার শিক্ষয়িত্রী, প্রতিভাময়ী এক নারী,
ভুলিনি আজো যাঁর নাম,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
মনোমুগ্ধকর রাঙ্গামাটি শহর,চারিদিকে পানি,
সৌন্দর্য্যে নয়নাভিরাম,সেখানে যাঁর অধিস্থান,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
তিনি এক প্রগতিশীল লালনা,
নিঃসঙ্গ ত্যাগের মাঝে যাঁর সাধনা,
জীবন নদ তীরে দাঁড়িয়ে স্মরি আজো যাঁর নাম,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
এ মানব বিশ্বে মুক্ত বিহঙ্গে আঁখি মেলে
রয়েছে কত সোনালী প্রভাত,
তবু আমি ছিলাম বন্দী নিরক্ষতার দাস।
আমার এ আঁধার রাতে এলেন এক নন্দিতা মানবী মহান,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
মানব সমুদ্রে জ্ঞানের তরঙ্গে যাঁর অনন্ত্ম সাধনা,
হৃদয়ে অপার করুণা, পূজনীয়া সর্বজন
নিজেকে করেছিলেন শিক্ষার মাঝে বিসর্জন,
তিনি এক গুণবতী মহিলা প্রতিভাবান,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।
তিনি উদার আকাশ স্নেহে মাটির পৃথিবী,
আমার প্রণতিতে আঁকা যাঁর হৃদয় ছবি।
আমার মুখে ভাষা চোখের দৃষ্টিতে যাঁর এত প্রতিদান,
শ্রদ্ধেয়া সাহানা দেওয়ান।

.....

** বরদেন্দু চাকমা, কবি, দিঘীনালা।*

মিনাক্ষী চাঙমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চাই

জাগো আদিবাসী জাগো।
রাস্তায় নেমে স্লোগান ধরি।
হারাবোনা নিজেদের ভূমি।
পাহাড়ের উত্তেজনা ,আগুন জ্বলবে।

রক্ত দিয়েছি,আরও রক্ত দেবো।
সংগ্রাম চলবে,যুদ্ধ হবে।
হাতে শক্ত করে অস্ত্র ধরি।
বাঁচা মরার যুদ্ধ করি।
এ জায়গা, ভূমি আমাদের।
ছাড়বো না প্রিয় লীলাভূমি।

ভাই,বোন সবাই জেগে উঠি সংগ্রামের মিছিলে।
যেখানে আছি সেখানেই থাকব।
বাঁচলে সবাই বাঁচব।
আন্দোলন চলবে,চলতে থাকবে।

গর্জে তুলি সারা বিশ্ব।
আমরা মানব না,মানি না।
অত্যাচার, অসহায় মায়েদের বুক খালি।
আসুন সবাই এক হয়ে রাজপথে নামি।

স্লোগান ধরি,'পার্বত্য চট্টগ্রামের সবগুলো ক্যাম্প নামিয়ে নাও।
বাংলাদেশ সরকার আদিবাসীদের সুখ ফিরিয়ে দাও'।
অনেক সহ্য করেছি নির্মম অত্যাচার।
চাইনা যুদ্ধ করতে,অস্ত্র ধরতে।

আদিবাসীরা পাবত্য চট্টগ্রামের শান্তি চাই,
নিজের ভূমিতে বসবাস করতে চাই।

.....

** মিনাক্ষী চাঙমা, উদীয়মান কবি ও শিক্ষার্থী, রাঙামাটি।*

Nirmal Kanti Chakma

Moment

No star in the sky
It may be rain
Home at all alone
Watch is moving gently
With soft sound
Tik tok tik tok
Frogs are seabing with rythm
Shouting unknown insects together
Totally sleepless moment
And dask night too,
Mind is swiming in the
white rivers
Parent are sleeping
with ealling nose,
May be dreaming or
visiting unknown kingdom
Light is giving tonight face,
Oh! really silent night and its two!
Tomorrow will come after the night
And give a nice day
But never change night and day
Change only mind and moment.

Tanmoy Chakma

Lighiting Up

Wake up Chakma Nation
Don't stay in darkness,
Come up in light.
Show the people of World
Nothing is impossible for us.
Fight for your own ownership
If you won
This Fighting
I was right
You love your nation.

.....

** Tanmoy Chakma ,Dighinala.*

.....

** Nirmal Kanti Chakma, Teacher, Jurachari.*

জির কুং সাহু

আমার ছেলেবেলা

অস্বচ্ছ দু'য়েকটি ব্যতীত আমার জন্মস্থান অর্থাহ্ পাড়ার তেমন কোন স্মৃতি আমার মানসপটে নেই। বাবার বাইবেলের শেষ পৃষ্ঠায় আমার জন্মদিন লেখা আছে - জানুয়ারী ৬, শুক্রবার রাত্রি ১০টা, ১৯৫০। আমার নাম রেখেছেন বম সমাজে প্রথম খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক পাষ্টর এইচ ডালা। উনি মিজোরামের সিরতে নামক গ্রামের লোক। নাম রাখার সময় নাকি বলেছিলেন - "তোমরা এ দুর্গম প্রত্যন্ত্ম অঞ্চলের আলোকিত পরিবার, শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাওয়া পরিবার,তোমরা এ অঞ্চলের শিক্ষার শিকড়, বৃক্ষ। ইংরেজীতে বললেন, "Root of Education" বাবা মাকে বললেন, "তোমাদের এ ছেলে সন্ত্মানের নাম জিরকুং (Zir Kung) রাখলাম।"জির (zir) শিক্ষা, কুং (Kung) শিকড় বা বৃক্ষ। উনি শিক্ষার শিকড় বা বৃক্ষ আমাকে বা আমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে, লক্ষ্য করে বলেন নি। আসলে উনি আমার নানা চালখুপ হেডম্যানের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। আমার মা চালখুপ হেডম্যানের দ্বিতীয় কন্যা সন্ত্মান। আমার বাবা জীবনে একদিনের জন্যও স্কুলে যান নি; উনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। নিজে নিজে শিখে বাইবেল পড়তে পারতেন, গীর্জার উপদেশ (Sermon) লিখতে পারতেন। আমার মা ভারতে মণিপুর রাজ্যের চুড়াচাঁদপুর (Churachand pur) English Midle School এ তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত্ম পড়েছেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় চুড়াচাদঁপুর থেকে পালিয়ে আসেন, আর ফিরে যাননি। আমার নানা সেই ১৯৩৭ সালে তার কিশোরী মেয়েকে সেই মিজোরামের পরে মণিপুরে লেখাপড়ার জন্য পাঠিয়েছেন। পাষ্টর এইচ ডালা ঠিকই বলেছেন-আলোকিত পরিবার। আমার মা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেন না তখন কিভাবে যেতেন, তখনকার দিনে সেই অর্থাহ্ পাড়া থেকে রুমা বাজার, বান্দরবান, তারপরে চট্টগ্রাম, তারপর ট্রেনে করে কোথাও কোথাও নাকি বিশাল পর্বতের গুহার ভিতর দিয়ে ট্রেন চলে যায়, নৌকায় একদিন বা দু'দিন আর পায়ে হাঁটা একদিন পুরোদিন। তখনকার চট্টগ্রাম শহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ি না কি বাঁশ ও শনের।

আর্থাহ্ পাড়ার আমার একটি অস্বচ্ছ স্মৃতি-একদিন বাবার লাইটার হারিয়ে যাওয়া এবং হারিয়ে যাওয়ার সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা আছে-কোন এক সময় ওই লাইটার আমি ধরেছি, আমিই হারিয়ে দিয়েছি। এই অভিযোগ। তাই রাত্রে কুপি বাতি নিয়ে গোবর মিশ্রিত বালুময় মাঠে অনেকক্ষণ খোঁজাখোঁজি করেছি। আমাদের মাচাং ঘরের সামনে ধূধূ বালুময় জায়গাটির এ মাথা ও মাথা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি-পাই নি। আমার আর একটি অস্বচ্ছ স্মৃতি-ছোটবেলায় আমি নাকি মিষ্টি খুবই পছন্দ করতাম। চুরি করে খেতাম। বাবা একদিন

এক জালা গুড় রুমা বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসেন,দড়ি দিয়ে আমার গলায় বেঁধে দিয়েছেন, যাতে আমি ইচ্ছে মত খেতে পারি। এ জাতীয় অস্বচ্ছ স্মৃতি ছাড়া আমার ছোট জন্মস্থান অর্থাহ্ পাড়া নিয়ে আমার তেমন স্মৃতি মনে নেই। খুব সম্ভব আমার বয়স তিন কি চার তখন কয়েকটি পরিবার আর্থাহ্ পাড়া থেকে এক কি দেড় কি. মি. দুরের পাহাড়ি বসতির জন্য চলে আসেন। নূতন পাড়ার নাম রাখা হয় মুননুয়াম। অর্থ মনোরম স্থান। আমার এক মামার (লিয়ান থার) সাথে আর্থাহ্ পাড়া স্কুলে যেতাম। কি পড়তাম ঠিক মনে পড়ে না। আমাদের বম ভাষার লিপি/বর্ণমালা এক পাতায় টাইপ করা A, AW, B, বর্ণমালা হাতে রাখতাম। আমার পাড়াতে আরো বেশ ক'জন ছেলেমেয়ে ছিল তাদের কেউ আমার সাথে স্কুলে যেত না। মাঝেমধ্যে স্কুল ফাঁকি দিতে চাইতাম, পথে দাঁড়িয়ে থেকে না যাওয়ার তাল করলে মামা বাশের লম্বা কঞ্চি দিয়ে আমার পায়ে বারি দিতেন। আমার খুব খারাপ লাগত। আমাকে ভাবিয়ে তুলত আমি একলা কেন? আমার সংগে অন্য ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে না কেন? পাড়ায় তো আরো আমার বয়সী অন্য ছেলেরা ছিল। আমার গোটা পরিবার আমার বাবা মা, দিদি,মেজো বোন আর আমার পরের ভাইবোন সেই সাত সকালে জুমে চলে যেত, বাড়িতে আমি একা থাকতাম, স্কুলে যাওয়ার জন্য। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসত সকলেই। বাড়িতে আমার অত্যাবশকীয় কাজ হত পানি আনা, রাত্রের জন্য ভাত রান্না করা, ধান শুকানো, কাপড় চোপড় রৌদ্রে দেওয়া ইত্যাদি। তরকারি রাঁধতে হত না। জুম থেকে ফিরে এসে মা রান্না করতেন। স্কুলের পরে আমার তো অনেক কাজ। অন্য সমবয়সী ছেলেরা শিষ দিয়ে ডাকত আমাকে, খেলতে যাওয়ার জন্য। আমার কিযে ইচ্ছে হতো। যাওয়া হত না। করনীয় কাজ না হওয়া গেলে মা'র বকা খেতে হবে ।

এক দিন এক মজার কান্ড ঘটে। আমাদের বাড়ির সামনে একটি পেয়ারা গাছ ছিল। খুবই সুস্বাদু, ভেতরটা লাল। সে বছর অনেক পেয়ারা ধরেছিল। বাবা বাঁশ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। বেড়াটি যথেষ্ট উচুঁ ছিল। আমার দু'বন্ধু চুপিচুপি এসে আমাকে শিষ দিয়ে ডাকল। আমি উত্তর না দিয়ে চুপটি থাকি, বেড়ার ফাঁক দিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছি। ওরা মনে করেছে যে আমি বাড়িতে নেই, হয় পানি আনতে গিয়েছি। নির্ভয়ে ওরা পেয়ারা গাছে উঠল। বড় বড় পাকা পাকাগুলো পেড়ে পেড়ে খেল আর বেশ কয়েকটি হাতে নিয়ে নামতে থাকল। তখনই আমি বাবার গলার মত করে উচ্চস্বরে ডেকে ঘরের মেঝেতে এমন দাপাদাপি করে ভয়ংকর আওয়াজ যে তুললাম বেচারারা ভয়ে দ্রুত নেমে পড়ল, কিন্তু সহজে বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালাতে পারল না, আমি দরজা খুলে বের হলাম, হাসতে হাসতে ওদের কাছে গেলাম, ওরা খুব লজ্জা পেল। কিছুই না বলে একদিকে দৌড়ে গেল ওরা । পেয়ারা কতক গাছের নীচে পড়ে রয়েছে দেখলাম।

আমার শৈশব কেটেছে খুব অভাব দারিদ্রে, বাবা মার অতি শ্রমেও বছরের খোরাকি ধান হত না, কোন কোন বছরে ধান সংকুলান হলে অন্যের কাছে থেকে ধার করতে হত। আমার

লেখাপড়া অর্থাৎ শিক্ষার জীবন শুরু বলতে সব রকমের সুযোগ সুবিধাহীন, বৈরী পরিবেশে। তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে যখন উঠেছি নূতন বই বিতরন হচ্ছিল, বাবা কোন টাকা জমা দেন নি তাই আমার নাম ডাকা হচ্ছিল না। ঘরের মেঝেতে (আমার নানা চালখুপ হেডম্যানের ঘর) ক্লাশ ওয়ারী বই সাজানো রয়েছে। ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে অন্যের বই নেওয়া দেখছি- নূতন বই পেয়ে আনন্দে ঘরের উচুঁ উঠান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যরা। আমি তখনো দাঁড়িয়ে । * একদম শেষে আমার নাম ডাক পড়ল। মনে হয় যে দু'য়েক সেট অতিরিক্ত ছিল। বইগুলো নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়। বই খুলে বইয়ের খাঁজে মুখ লাগিয়ে নূতন বইয়ের গন্ধ নিলাম। উফ কি সুগন্ধ বইয়ের । অনেকক্ষন গন্ধ নিলাম। জীবনে এ রকম আনন্দ পাইনি যেন। বুকে কতক্ষন নাকে কতক্ষন। ঘুমাবার সময়ও মাথার কাছে বই। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে আমার বেশ কয়েকটি বই হয়ে যায়, পুরান খাতা বড় সুঁই দিয়ে সেলাই করা দু'টা সহ লুসেই ভাষার পবিত্র বাইবেল সহ ইয়া উচা বই নিয়ে স্কুলে যেতাম। অনেক বই হাতে, বেশ উপরের ক্লাশে যে উঠেছি তা লোক দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। এই করে বেশ তৃপ্তি পেতাম।আমরা খুবই দরিদ্র পরিবার ছিলাম, পঞ্চম শ্রেণীতে উঠার আগ পর্যন্ত্ম বাবা আমাকে কলম কিনে দেন নি। শ্লেট ব্যবহার করতাম। একটি বাঁশকে দু'ফালি করলে ভেতর অংশটি ধবধবে সাদা, সেটাই হত আমার লেখালেখির রাফ খাতা। বাবা যতবার বাজারে যেতেন ততবারই আমার প্রত্যাশা থাকত এবার বাবা আমার জন্য একটি কলম কিনে এনেছেন। সন্ধ্যা হয়ে যেতো বাড়ী ফিরতে, কিন্তু না। প্রতিবারই আশাহত হতাম। কাঠের কয়লা দিয়ে বাঁশের ভেতরের সাদা অংশে আমি লিখতাম। বই কেনার পয়সা না থাকায় দিস্ত্মা কাগজে আমার পাঠ্য বই কপি করে নিতাম।

তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণী পড়াকালে একটি দূর্ঘটনায় আমার ডান হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়। একটা বছর আমার মিস যায়। আমার এক মামার বাগানে একটি আছার গাছ (সঠিক নাম) ছিল। সেই আছার গাছে অনেক ফল ধরেছে, ফলগুলো কালো, সাধারণত খায় না, আমরা ছেলেরা দুষ্টুমি করে খাই, চিবিয়ে চিবিয়ে রসটুকু নিয়ে তারপর ফেলে দেই । একদিন আমরা তিন বন্ধু চুপিসারে গাছে উঠেছি, আমি এক ডালে বসে খাচ্ছি। ডান দিকের একটি ডালে একসাথে অনেকগুলো পাকা ফল, লোভ হল। ডালের এক আগা ধরে খুব জোরে জোরে টান দিচ্ছিলাম, সব ডাল নাগালের মধ্যে না আসা পর্যন্ত্ম গায়ে যত জোর আছে দিয়েছি টান, এর মধ্যে যে ডালে বসেছিলাম আমার মূল সাপোর্ট সে ডালটি ভেঙ্গে যায়। আর যার কোথায় সরাসরি মাটিতে। আধ ঘন্টার মত বেহুস। বন্ধুরা কেউ নেই, সব পালিয়েছে। কমসে কম ১৫-২০ ফুট উঁচু ছিল। আমার হুস ফিরার পর বাড়ির দিকে যাচ্ছি এ সময় আমার এক মামা দুর্ঘটনা জানতে পেরে দিল খুব বকাঝকা, বাড়িতে কেউ ছিল না। সব জুমে। বাড়িতে আমি একা ছিলাম। বাবা মা সেই বিকাল বা সন্ধ্যায় ফিরত। বাবা ঘরে ঢুকে দু'য়েকটি থাপ্পর দিল। মা খুব স্বস্নেহে আমার কব্জি ভাঙ্গার জায়গা দেখল। পিঠে

বুকে হাত দিল। মা বুঝল যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পাড়ার শেষ মাথার এক বয়স্ক লোককে ডেকে নিয়ে জানতে পারল যে কব্জি হাড় ভাঙ্গা এবং মাজার অবস্থা ছাড়তে ৬ মাস সময় লাগবে। উনি ঠিকই বলেছেন আমাকে প্রায়ই ৬ মাসের মত কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। ক্লাস থ্রি অথবা ক্লাশ ফোর এক বছর গ্যাপ গেল। পরীক্ষা দিতে পারি নি।

এক খুব মজার ঘটনা। পাড়ার এক লোক হরিণ শিকার করে বাড়িতে এনেছে, কজনা মিলে মাচাং ঘরের উঠানে খোলা জায়গায় মাটির চুলা বানিয়ে রান্না করছে। আমরা তিন বন্ধু পাড়াময় ঘুরঘুর করছিলাম। হাতে পাখি মারার ধনুক (Sai)। ঐ বাড়ীর সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন মাংসের সুঘ্রাণ নাকে এলো, ও রে সে কি লোভনীয় ঘ্রাণ। রান্না করা শেষ হলে পরে মাংসের ডেকচি বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল ২ জনে। আর খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুনছিলাম। সাধারণত কেউ শিকার পেলে হয় মাংস পাড়া পড়শী আত্নীয় স্বজনকে ভাগ দেয় নতুবা রান্না করে একত্রে খায়। খুব সমাজ সিদ্ধ কাজ এটি। আমরা মনে করলাম আমাদেরকে খেতে ডাকবে। আমরা ঐ বাড়ীর আশেপাশে খুব ঘুরঘুর করলাম, শব্দ করে হাসাহাসি করলাম যাতে আমাদের উপস্থিতি ওনারা জানতে পারেন, নানানভাবে আমরা ঐ বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি আর্কষণ করার চেষ্টা করলাম। কপাল এমনটি খারাপ সেদিন আমাদের শেষ পর্যন্ত কেউ খেতে ডাকল না। আমরা চলে এলাম।

আর্থাহ্ পাড়ায় যে স্কুলের কথা বলছি-সেখানে আমার বসার কোন নির্দিষ্ট ছিল না। মাঝে মাঝে বড়দের ক্লাশে বসতে হতো। বড় ক্লাস বলতে সম্ভবত ষষ্ঠ-৮ম শ্রেণী। ইংরেজীতে ক্লাশ হত। পাষ্টর এইচ ডালা এবং আমার নানা চালখুপ হেডম্যানের উদ্যেগে এই English Middle School চালু করা হয়। ১৯৫৫/৫৬/৫৭ সালে আর্থাহ্ পাড়াতে একটি English Middle School স্থাপিত হয়। শিক্ষকদের মধ্যে মনিপুরের চুড়াচাঁদপুর Mission School থেকে পাশ করা লোকেরাই ছিলেন, তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় এল দৌলিয়ান ও শ্রদ্ধেয় প্রয়াত এস. এল. পারদৌ ছিলেন। শ্রদ্ধেয় এল দৌলিয়ান মনিপুর রাজ্যের জরহাট (Jorhat) থেকে Matric পাশ করেছেন,আর এস.এল. পারদৌ রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। সালটা ১৯৫৫।

চালখুপ হেডম্যানই বম গ্রামে প্রথম বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেন। ফজলুল কবির নামক প্রথম বাঙ্গালী শিক্ষককে নিয়ে আসা হয় এরপরে ক্ষিতিশ চন্দ্র বিশ্বাস নামে আরেক বাঙ্গালী শিক্ষক নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে এ লোক 'মুকুল পা' (Mukul pa) নামে বেশি পরিচিত লাভ করেন। আর বম গ্রামে প্রথম বাংলা শিক্ষক ছিলেন আমার এক মামা যিনি আমাকে মুননোয়াম পাড়া থেকে পুরাতন আর্থাহ্ পাড়াতে নিয়ে যেতেন। নতুন মুননোয়াম পাড়াতে নিয়ান থার। আর্থা পাড়াতে প্রথম বাংলা শিক্ষার স্কুল খোলা হয়। শুনেছি বমদের গ্রামের প্রথম স্কুল পানক্ষ্যং পাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২২ সালে। তখন কোন স্থাপনা স্কুল মিশন কার্যালয় স্থানান্তর হয় নাই। আর্থাহ্ পাড়া থেকে মুননোয়াম পাড়াতে চলে

আসার/নূতন পাড়া স্থাপন বা চলে আসার খুব যুক্তিযুক্ত কারণ আমার জানা নেই। আর্থাহ্ শব্দের দুটো অর্থ পাওয়া যায়। কেউ বলেন Arthah নয় আসল নাম হল Arthlah. Arthah মানে মুরগী/ মোরগ মারা অপর পক্ষে Arthlah মানে মুরগী/ মোরগ ছেড়ে দেওয়া। ছেড়ে দেওয়া ও সঠিক অর্থ নয় ব্যাপারটা/ ঘটনাটা নাকি এরকম যে বেশ ক'জনা লোক কোন কাজে বনে ঐ জায়গায় গিয়েছিল সংগে ছিল একটি মুরগী। দুপুরে খাওয়ার জন্য সম্ভবত। অসাবধানতাবশত মুরগীটা একজনের হাত থেকে ছুটে গিয়ে বনে চলে যায় আর ধরতে পারে নাই। তাই ঐ জায়গার নাম পরবর্তীতে Arthah হয়ে যায়। উচ্চারণ তারতম্যে আর্থাহ্ (Arthah) টি টিকে যায়। আর্থাহ্ পাড়াটি ১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। এক সময় তার খুব যশ, নাম ছিল। ছিল একটি বাইবেল শিক্ষা স্কুল, English Middle School, Hostel/ Boarding ছিল। মিশন হেডকোয়ার্টার ছিল। এক আমেরিকান মিশনারী দম্পত্তি এ গ্রামে বছরখানেক ছিলেন। বম সমাজকে এগিয়ে দিয়েছেন অনেক খানি। এখন সে গ্রাম এক জীর্ণ শীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম। পানির তীব্র অভাব। এ গ্রাম আমার জন্মের সময়ে যে সংখ্যক পরিবার ছিল তার বর্তমানে নেই। আশেপাশের পানির উৎস/ছড়াগুলো সব শুকিয়ে কাঠ। বর্ষার সময় যে কটা দিন বৃষ্টি পড়ে ততদিন মাত্র তাদের আয়ু। আমাদের পাহাড়ী গ্রামগুলোর চিত্র প্রায়ই ঐ রকমের। শ্রীবৃদ্ধির বদলে শ্রীহানি হতে থাকে,আর্থাহ্ পাড়ার বয়স ১০০ বছর, ১০০ বছরে এ পাড়ায় পরিবার সংখ্যা লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার কথা, তা না হয়ে বর্তমানে মাত্র কটি পরিবার। বাঁশ শনের অভাবে তক্তা পাটাতনের ঘর বাড়ী হয়েছে। সেই ১৯ থেকে আজ পর্যন্ত্ম কারো পাকাঘর হয় নাই। যোগাযোগের সমস্যাই বোধ হয় এর প্রধান কারন। তাছাড়া জীবিকার ধরনও আগের মতই জুম চাষই প্রধান; তবে আদা হলুদের চাষ ইদানিং বেশ বেড়েছে। রুমা বাজার-আর্থাহ্-মুননোয়াম জীপ সার্ভিস আছে। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরই মধ্যে ৪ জন মারা গেছে।

আমি মুননুয়াম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করি। তখন বিদ্যালয়টি সরকারী হয় নি। খুব সম্ভব মুননুয়াম পাড়ার বিদ্যালয়টি ১৯৬৪ সালে সরকারী হয়। এই বিদ্যালয়ে পড়াকালে আমি বাংলা বলতে পারতাম না। পড়াগুলো সব মুখস্ত্ম ছিল। কোন প্রশ্নের জন্য কোন উত্তর ব্রাকেটের মাধ্যমে চিহ্নিত করতাম আর ঐ প্রশ্ন আসলে পরীক্ষাতে ব্রাকেটে চিহ্নিত করা লাইনগুলো উত্তরে লিখতাম। প্রশ্নের অর্থ আর আমার উত্তরের কথার মানে আমি জানতাম না। "মুননুয়াম পাড়া থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করিয়াছি," এই একটি মাত্র বাংলা বাক্য সম্বল করে চট্টগ্রামের পাথরঘাটাস্থ St. Placid স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য আমার মামা লাল ঙাক আমাকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন।(আমার জানামতে আমার এই মামা লাল ঙাক বম (Late Van Lal Ngak) বান্দরবান পার্বত্য জেলায় প্রথম BA পাশ । (তিনি বাংলায় নিজের নামলাল নাগবম-এভাবে লেখেন। ভান লাল ঙাক চালখুপ হেডম্যানের ২য় সন্ত্মান। উনি ১৯৬৫ সালে BA পাশ করেন। চট্টগ্রাম

কলেজ থেকে। এই লাল ঙাক মামাই আমাকে চট্টগ্রাম শহর নিয়ে আসেন ১৯৬৪ সালে।)

তখন St. Placidএর Principal ছিলেন Bro Raymond.এক কানাডীয়রক Brother ছিলেন, উনিও Canadian,তখন আমার মামার সাথে বান্ডেল রোডস্থ তখ লোক, পুরো নামটি আর মনে নাই। আরেকজন Hammel নামে আে নকার উপজাতীয় ছাত্রাবাসে থাকতাম। দেখতাম আমার মামার অধিকাংশ বন্ধুরা চাকমা, IA or BA তে পড়েন, বয়সী সব। বড় বড় বয়স তাদের। আমার বাংলা না জানাটা আমার জন্য দুঃসহ হয়ে উঠে। মামা কাছে না থাকলে আমার মন ভীষণ উত্তলা হয়ে যেত। মামার চাকমা বন্ধুরা আমাকে স্বান্তনা দিতে পারত না।

St. Placid এর Principal Bro. Raymond এর রুমে এক মজার কান্ড ঘটে যায়। আমার সম্বল "আমি মুননোয়াম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করিয়াছি"। তোমার বাবা কি করেন,তুমি কেমন আছো,তোমার বাড়ী কোথায়? ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তরও ঐ একই "আমি মুননোয়াম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাশ করিয়াছি"। আমাকে যখন বাংলা ইংরেজী পড়তে লিখতে দেয়া হয় দারুণ পারি। আমার পড়ার ধরন আর সুন্দর লেখা দেখে Brother খুবই অবাক হয়ে যান। পঞ্চম শ্রেণীর বই থেকে বাংলা ইংরেজী লিখিত আকারে প্রশ্ন করেছেন আমি সাবলিলভাবে প্রতিটি উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছি। এতে Brother রা যারপর নাই অবাক হন। আমাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করাবেন কি না দ্বিধায় পড়ে যান। একেক দিনে একেক ক্লাশে আমাকে আনা নেয়া হয়। একদিন পঞ্চম শ্রেণীতে আরেকদিন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে। আমিও বুঝতে পারছি যে আমাকে নিয়ে Brother এক রকম সমস্যায় পড়েছেন। সিদ্ধান্ত্ব নিতে পারছেন না। এর মধ্যে মামা চন্দ্রঘোনাস্থ মিশনে এক বৃটিশ মহিলা পরিচালিত (MissBins) Baptist Mission Junior High School এ আমাকে ভর্তি করিয়ে নেন। চন্দ্রঘোনা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন জুনিয়র হাইস্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত পাকসিম বয়তস্নুং ও জুয়ামলিয়ান আমলাই। তারা আমার নীচের ক্লাশে। ঐ সময় সব চেয়ে কষ্টকর ব্যাপার ছিল বোর্ডিং/স্কুল বন্ধ হলে বাড়ি যাওয়া। আমরা পায়ে হেঁটে বাড়ি যেতাম। মিশন এলাকা থেকে দোভাষী বাজারের ঘাটে নেমে কর্ণফুলী নদী সাম্পানে পার হয়ে নারানগিরি তারপর হাঁটা। রাজস্থলি বাজার, কাপ্তাই বাজার, কোন সময় কাপ্তাই বাজারে রাত্রি যাপন। পরের দিন ভোরে হাঁটা একদিন কি দু'দিন হাঁটার পর পৌছতাম জুয়ামলিয়ানদের গ্রাম অথবা পাকসিমদের গ্রাম- আলেক্ষ্যং মৌজার উইফুম পাড়া অথবা লুংলেই পাড়া। ওরা পাকসিম জুয়ামলিয়ান দু'জন নিজ বাড়ীতে পৌছে গেলেও আমার তো আরো এক কি দু'দিনের রাস্ত্বা বাকি। রৌচেও নামে এক নার্স শিক্ষার্থী আমাদের সংগে থাকতেন। তার বাড়ী বাকতস্নাই পাড়া,আমি তার সংগে তার গ্রামে যেতাম, তার গ্রাম থেকে পানক্ষ্যং পাড়া ২ কি ৩ কি.মি. দুর, তিনি আমাকে পানক্ষ্যং পাড়া প্রবেশদ্বার পর্যন্ত্ব দিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যেতেন। উনার বাড়িতে একবার তো ধান কাটার

সময়ে একসপ্তাহ ছিলাম। ধান কাটার মৌসুম তাই আমাকে পরবর্তী পাড়াতে দিয়ে আসতে সুযোগ আসছিল না, আমিও তাদের সাথে জুমের ধান কাটতাম, খুব ভোরে উঠতে হতো। পরে কোন এক সুযোগে ভোরে রওনা দিয়ে আমাকে পানক্ষ্যং পাড়ায় দিয়ে আসেন। গ্রামের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত্ব দিয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে গেলে একলা ওই গ্রামের ভেতর হেঁটে হেঁটে আমার মাসীদের ঘর খুঁজে বের করি। এ গ্রামে আমার এক মাসী থাকতেন। পানক্ষ্যং পাড়া থেকে আর্থাহ্ বা মুননোয়াম যেতে আরো দু' ঘন্টার পথ। পানক্ষ্যং পাড়া থেকে আর্থাহ্ বা মুননোয়াম পাড়া যাওয়ার লোক কেউ পাওয়া না গেলে সপ্তাহ খানেকের মত পানক্ষ্যং পাড়ায় অপেক্ষা করতে হতো। তারপর কোন এক সু'দিন উপস্থিত হলে কারো সংগে আমার নিজ গ্রামের দিকে যাওয়ার সুযোগ হত। আবার ছুটি বা বন্ধ শেষ হলে সেই একই পথে আবার যাত্রা। মুননোয়াম থেকে আর্থা পাড়া হয়ে পানক্ষ্যং, পানক্ষ্যং থেকে আলেক্ষ্যং এর উইফুমবা লুংলেই, সেখান থেকে ডাক বাংলা রাস্ত্বা হয়ে রাজস্থলি মতি পাড়া, সোনা পাড়া, ভাইরেল পাড়া, ত্রিপুরা পাড়া, মার্মা পাড়া, ইত্যাদি হয়ে নারানগিরি কর্ণফুলী নদী,সাম্পানেও পারে এসে চন্দ্রঘোনা মিশন। সেখানে আমাদের বোর্ডিং। আমাদের এ লেখাপড়ার কষ্টকর আসা যাওয়ার বা আনা নেওয়ার সময় বড় ভূমিকা নিতেন জুয়ামলিয়ানের বাবা। ছোট ছোট বাঁশের চোঙায় আমাদের জন্য খাবার নিতেন, পথের খাবার । স্কুলে রেখে আসার পর আরো সপ্তাহ খানেক আমাদের কাছাকাছি ক্ষ্যং পাড়ায় কারো ঘরে থাকতেন, যাতে বাড়ির জন্য আমাদের মন খারাপ হয়ে না যায়। স্কুল ছুটির আগেই তিনি মাঠে বসে থাকতেন, ক্লাশ রুম থেকে বেরুলেই যেন তাকে দেখা যায় অমনভাবে বসে থাকতেন, তাকে দেখতে পেলে আমাদের মন শান্ত্ব হয়ে উঠত।

অন্য সময়ে অন্য রকম আসা যাওয়া করতাম। মুননোয়াম থেকে রুমা বাজার দীর্ঘ ১২ মাইল পায়ে হেঁটে, তার পর রুমা থেকে বান্দরবান নৌকায়, সারাদিন লেগে যেতো। বান্দরবান থেকে দোহাজারী কখনো জীপ গাড়ীতে (যে জীপ গাড়ী চালু করতে লোহার ডান্ডি দিয়ে সামনে ঘুরান দিতে হতো) অথবা কখনো নৌকা করে আসতাম। তারপর দোহাজারী রেল স্টেশন। একবার ট্রেনে আসবার সময় এক মজার কান্ড ঘটে। লাল ঙাক মামার নেতৃত্বে আমরা ক'জনা জুয়ামলিয়ান,পাকসিম,আমি,আর বান্দরবান অথবা দোহাজারী এ. রহমান জামিজুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫/৭ জন ছেলে সহ চট্টগ্রাম যাচ্ছি। রেল ষ্ট্রেশনে বসে লাল ঙাক মামা আমাদের চেয়ে বড় বয়সীদেরকে দোহাজারী-চট্টগ্রাম ট্রেনের টিকিট সংগ্রহ করতে দায়িত্ব দেন, নিজ পরিচিত জায়গার বাইরে চলতে ফিরতে কে কত চালু হলো তা তিনি পরীক্ষা করার জন্যই নাকি তিনি এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের (জুয়ামলিয়ান, পাকসিম ও আমাকে) দেখিয়ে মামা ওদেরকে বললেন, এ যে এরা ছোট বাচ্চা এদের টিকেট কিন্তু হাফ (Half) এদের জন্য হাফ টিকেট। বড়রা টিকেট কাউন্টারে গেল। কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরে এলো, ততক্ষনে রেলের বাঁশী বেজে উঠল, লোকের অনেক ভীড়, দৌড়াদৌড়ি চতুর্দিকে। আমরা দৌড়ালাম। টিকেটগুলো

সব আমার মামার হাতে। আমরা খুব সম্ভব ৯ জন ছিলাম। আমরা কিন্তু এক সাথে একই কামড়ায় বা বগিতে উঠতে পারি নাই। পাশাপাশি দুই বগিতে উঠেছি। রেল চলতে শুরু করেছে- বেশ কয়েকটি স্টেশন পারাপারের পর মামা লক্ষ্য করেন যে টিকেট গুলো সব হাফ। মানে দোহাজারী থেকে পটিয়া স্টেশন পর্যন্ত্ম টিকেট । দোহাজারী চট্রগ্রাম পুরো টিকেটের পরিবর্তে হাফ পথের টিকেট পটিয়া পর্যন্ত্ম। পটিয়া পৌঁছলে মামা তড়িঘড়ি করে পটিয়াতে নেমে যেতে বললেন। মানুষের ভীড়ে দু'জন ছেলে তো পটিয়াতে নামতে পারে নাই। মামা তো মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন। পটিয়াতে নেমে পটিয়া-চট্টগ্রাম টিকেট কিনে অপেক্ষা করতে থাকলাম পাবর্তী ট্রেনের জন্য। সন্ধায় পৌঁছলাম চট্টগ্রাম স্টেশনে । বেশ খোঁজাখুঁজি পর রেলের আনসারদের হেফাজতে বড় ছেলেদের পাওয়া গেল। ওদের চোখ ইয়া ফোলা ফোলা, লাল। রেল স্টেশন থেকে লালদীঘি। লালদীঘি এলাকায় একটি হোটেল, নাম ইম্পিরিয়াল হোটেল, আমাদের বমদের একমাত্র পরিচিত হোটেল। বমরা চট্টগ্রাম শহরে আসলে ওখানে ছাড়া অন্য কোথাও উঠে না। এই হোটেলে সবাই একত্র হলাম। মামার অগ্নিমূর্ত্তি দেখলাম। বড় ছেলেদের খুব বকাঝকা দিলেন। একটি হাসির গল্পও বললেন। এক লোক বন্দুকের কার্টিজ আর সেলাই মেশিন কেনার জন্য চট্টগ্রামে যাবেন। দোহাজারী থেকে ট্রেনে উঠেছেন। লোকের অনেক ভীড়। ট্রেনে খুব প্রস্রাব পেল তার, আর চেপে রাখা যাচ্ছে না,সামনে কোন এক ষ্ট্রেশনে গাড়ী থামলে গাড়ী থেকে নেমে কাজটা সেরে নেবেন ভাবলেন। কোন এক স্টেশনে গাড়ী থামল। এ সুযোগে ট্রেন থেকে নেমে মাঠে নামলেন, এদিক ওদিক শুধু মানূষ আর মানূষ । ফাঁকা জায়গা পেতে বেশ সময় গড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ চেপে থাকায় অনেক জমে গেছে, প্রস্রাব ও শেষ হচ্ছে না ততক্ষনে ট্রেনের হুইসিল পুঁ পুঁ বেজে উঠল, ঘ্যাট ঘ্যাট চলতে শুরু করল। ধীর থেকে দ্রুত আরও দ্রুত চলতে শুরু করল। লোকটার ত প্রস্রাব শেষ হয় নাই, অর্ধেক প্রস্রাব করে উঠে ট্রেনকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বললেন, "দম দম" (থাম থাম), না তার অনুরোধ ট্রেন শুনে নাই দ্রুত থেকে দ্রুততর করে চোখের সামনে থেকে চলে গেল, দেখাও গেল না। ঐ লোকটাকে খুঁজে পেতে এক সপ্তাহর উপর সময় লেগেছিল। চন্দনাইশ এলাকার কোন একটা স্থান হবে। উনি আক্ষেপ করে নাকি বলেছেন যে, রেলটা আমার কথা শুনল না। চলে গেল। এ রকম ভুল টিকেট কেনার বিষয় প্রশ্ন করলে বড় ছেলেরা বলল যে, তারা ঠিকই হাফ টিকেট দিতে বলেছিল। কিন্তু টিকেট মাষ্টার বুঝল অন্য রকম; আসলে ঠিকঠাক বলতে না পারায় ওদেরকে দোহাজারী চট্টগ্রাম লাইনের অর্ধ পথ দোহাজারী-পটিয়ার টিকেট দিয়েছেন।

.....

** জির কুং সাহু, কবি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বান্দরবান।*

শিদোলো তাবা দি' বিনি ভাত

মৃত্তিকা চাঙমা

অক্ত ঃ বেল্যা মাধান।

জাগা ঃ মন্ধাধোরী বাবর ঘর ।

(মন্ধাধোরী মা, পিনোন খাদী আর মাদাত খবঙ বান্যা। রূব'রাদী পিন্যা থেব'। চুলও এক্কা উক্ক পাগানা থেব'। উক্ক হুমত্তুন কেদ গোরি বধলত মদ ভোরিব'। ধাগেদী দিবে ভরন ভরন বধল থেবাক। পিনোন খাদী পিন্যা উক্ক গাভুর মিলে উক্ক চুধো বদল আহ্ধত গোরি এ্যাই)।

মন্ধাধোরী ঃ এ্যাই এ্যা-মা-চাগা হুলো দাগী নেযেয়োন্দে বদলো।

মা ঃ নয়ো লাগিব' (বধল ভরি ফুরেয়ঙ)

মন্ধা ঃ কয় বধল ঔহয়্যা ?

মা ঃ আরি বধল।

মন্ধা ঃ আচছা-মা,বাবা-দ', হাক্কে অহ্লে বাজারত্তুন এব'। এলেদ' মদ তোগেব'গী। এক্কান শদান গোরিবের মনে-কত্তে'।

মন্ধা ঃ তার-দ' এক্কা উক্কয় পেদ-ন' ভরে। এ্যা দিবে বধল লুগেই থোই, আদ্দান্যা বধলো লোই আর চুধো বধলোত পানি ভরি থোই দিয়।

মা ঃ দুগত্তুন এ্যাইনে, সেয়ান্যা লাজ দিদে ! এক্কা সেয়ান্যা ন' গোরিজ। বধলুন থগোই যা।

মন্ধা ঃ মুই গোরিম (বধলুন্দই যেবগোই)

মা ঃ মুই গাঙত যাঙর। হুম্মো এক্কা ধোই আনঙলোই ইয়ে।

নেপথ্যা ঃ যা যা (মন্ধাধোরী মা হুম্ম করত লোই যেবগোই। মন্ধা ধোরী উক্ক পিলে লোই এ্যাই চুধো বধলোত পানি ভরি থোই দি যেব'। হাক্কন পর নেপথ্যা উক্ক মানষ্যর লেবা লেবা গীদর র' শুন যেব)

নেপথ্যা ঃ শীদোলো তাবা দি বিনি ভাত বার্গী উত্তন তিন চিদোর (হাক্কন পর ভেদা দি দেগা যেব গাঞ্জা পিন্যা চাই কি পেগ ফুট ওই বাজার ঝলাবো উক্ক বাঝ কত্তা লোই শিগ গোরি কানাত গোরি

আলাঙ উলঙ গোরি এব)

বাপ ঃ ও মন্ধাধোরী মা,মন মিলে নে মানুষ মিলেই? (আহ্ধ' ইজিরেই) তেল্যা পুগও নেই। আঁ শিদোলো তাবা দিনে বিনি ভাত বার্গী উত্তোন তিন চিধোর, মন্ধাধোরী মা কুধু ওল? (জোগার পারি) মানুষ্যুন কুধু গেলা? (ইন্দি উন্দি চাদে চাদে বধলুন দেগী হুঝী ই শিরে নাজেব'। বাচার' ঝলাবো থোই বধলুন ধোরী চেই পানি বধলো আহ্ধত লভ')।

মন্ধা ঃ বা কি আন্যস ?

বাপ ঃ এ্যাই সিএ্যা, ঝলাবো, চাগোই। (মন্ধাধোরী তা বাবরে চেই মু চিমেই চিমেই আহ্ঝিব)

মন্ধা ঃ বা ধুন্দ খেবে নে না ?

বাপ ঃ ও মা এব্রে গম অভ। জানে মু জুরেইয়্যা। দে এক্কা বাঝেই আন। (মন্ধাধোরী ঝলাবো ধরি ভিধিরে যেবগোই, হাক্কন পর দাবা উক্কু লোই এ্যাই তা বাবরে দিব'। তা বাপবে দাবাবো মুওত দেনা সমারে সমারে মুওনত কালি চাগ উধিব')।

মন্ধা ঃ বা মুই যাঙর। (যাঙ যাঙ গোরিব')

বাপ ঃ যা যা তম্মা এলে কোজ ইধু এধ'।

মন্ধা ঃ (যাদে যাদে) অয় অয় কোম। (মন্ধাধোরী যেবগোই। তা বাবে বধলো চেই চেই আহ্ঝিব')

বাপ ঃ হাঁ হাঁ, শিদোলো তাবা দিনে বিনি ভাত বার্গী উত্তন তিন চিদোর (ঘঁদ ঘঁদ গোরি এক ধুপ খেই আলাঙ উলুঙ অভ'। আর' এক ধুপ ঘিলি মুওন চিরুক বিরুক গোরি পানিয়েন ফুঁসুত গোরি ফেলেই দিব') হিঁ পানি'কন্না থোইয়্যা? মন্ধাধোরী,মন্ধাধোরী! তম্মা ইজো ন'এযে? ওই মন্ধাধোরী। (রাগে ফালেব'-মন্ধাধোরী এক্কান আনা পিজেদী লুগেই আনি)।

মন্ধা ঃ কি বা, কি ? (মন্ধাধোরী আহ্ঝি রাগেই পারঙ ন' পারঙ অভ')

বাপ ঃ আট্য আনার ঘিহ্! (মন্ধাধোরী মা হুম্ম করত গোরি এ্যাই মন্ধাধোরী বাপরে দেগী আহ্ঝি রাঘেই ন' পারের)

মা ঃ আ কি ওইয়্যা মন্ধাধোরী বাপ ? হক্কে লুমিলেগী ?

বাপ ঃ কী, হক্কে লুমিলুঙ্গীদে ! বধলোত কন্না পানি থোইয়্যা ?

মা ঃ মুই নয়, ত ঝিবোত্তুন পুঝর গর।

মন্ধা ঃ মুই নয় বাবা মামাত্তুন পুঝর গোরি চা।

বাপ ঃ ঝিয়ো নয়, মোগও নয়, সালেন ভূদে ? না প্রেরেদে ?

মন্ধা ঃ বাবা আ তরে কন' ভূদ প্রেরেদে.....।

বাপ ঃ কি (মন্ধাধোরী আনায়ান দেঘেই)

মন্ধা ঃ রেনী চাদেই বা

বাপ ঃ এ্যাঁ আনা চেদুঙ ! মত্তুন দ' এব্রে আনা চেবার অক্ত ওইয়্যাদে !

মন্ধা ঃ তুই রেনী চানা। মন্ধাধোরী গুজেই দোঙ দোঙ গোরিব'। তা বাপে মওন বিজুং বাজাং গোরিব'। মন্ধাধোরী আনায়ান দেঘেই আদেক্যা গোরি তা বাপে তা নিজ' মুওন দেগী)

বাপ ঃ এ্যাঁ এ্যাঁ মুওন, কালী কন্না গুলি দিল' ? এই কালিয়েন....?

(সে সেরে মন্ধাধোরী লোই তাম্মা সেরেত গোরি ধাবা দিবেক)

এ্যা মন্ধা ধোরী মা, ও মন্ধা ধারী মা ! মন্ধাধোরী ও মন্ধাধোরী !

(দাবাবো ফিরেই পাগেই চেই) বুচ্ছঙ বুচ্ছঙ, তমারে এক্কা এযঙ সালেন। (মন্ধাধোরী বাপে আহ্লাঙ উলোঙ গোরি যেবগোই)

** মৃত্তিকা চাঙমা, শিক্ষক, মোনঘর উচ্চ বিদ্যালয়, রাঙামাটি।*

বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি'র

প্রকাশনা সফল হোক।

সবাইকে জানাই বিঝুর শুভেচ্ছা।

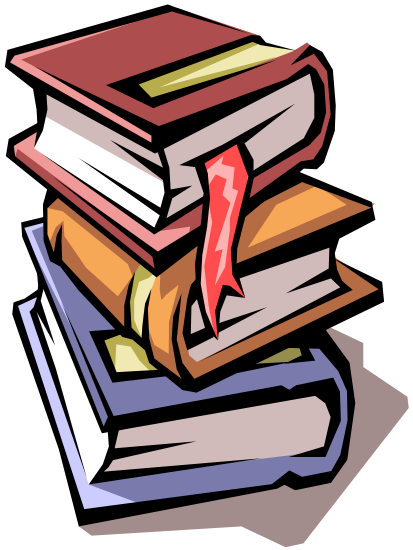

পার্বত্য চট্টগ্রাম গবেষনা কেন্দ্র

রাঙামাটি।

বিঝু বয়ে আনুক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি

বনযোগীছড়া ইউনিয়নবাসীকে

জানাই বিঝুর আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সন্তোষ বিকাশ চাকমা

চেয়ারম্যান

০২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়ন পরিষদ

জুরাছড়ি,রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

দৃষ্টি আকর্ষন!

গত ০৬ জানুয়ারী ২০১২ খ্রিঃ রাঙামাটি পার্বত্য জেলার জুরাছড়ি উপজেলার বনযোগীছড়া গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার চালু করা হয়। বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় এ পাঠাগারটি পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ পাঠাগারে দুইটি দৈনিক পত্রিকা সহ হাজারখানেক বই সংগ্রহ করা হয়েছে। এ পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমরা আরো বই সংগ্রহ করছি। যে কোন ধরনের বই (নতুন বা পুরাতন) আমরা গ্রহণ করি। কেউ যদি আমাদের পাঠাগারে বই দিয়ে সাহায্য করতে চান তাহলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নির্মল কান্তি চাকমা
মোবাইল: ০১৫৫৬৫৭৬৫৩৮
Email: bkkksrj@yahoo.com
পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক
বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতি
বনযোগীছড়া, জুরাছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

এ অহ্‌রিঙ ধাত্তাদেনোত দিনত

যেন আহ্‌জি ন'যায়

বনযোগীছড়া কিশোর-কিশোরী কল্যাণ সমিতি

চিতদিঘোল কোচপানা

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

বিঝু-২০১৫ইং সফল হোক।
সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

প্রধান কার্যালয়ঃ রাঙ্গামাটি।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি।

ফোন ঃ ০৩৫১-৬৩১৩২,৬৩১৪৭,৬৩২০৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৩৫১-৬২১৯২

বিঝু, সাংগ্রাই, বৈসুক, বিষু, বিহু' ২০১৫খ্রিঃ উপলক্ষে বনযোগীছড়া কিশোর কিশোরী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সংকলন প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই।

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুসম্পদ, সংস্কৃতি, কুটির শিল্প, সমাজসেবা, জনস্বাস্থ্য,সমবায়সহ ২৫টি হস্তান্তরিত বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণের কাছ থেকে সর্বাত্নক সহযোগিতা কামনা করছি।

বৃষকেতু চাকমা
চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।